



মাসুদা সুলতানা রুমী

বাতিঘর

মাসুদা সুলতানা রুমী



গাডিয়ান

পাবলিকেশনস

প্রকাশকের কথা

সাহিত্য জগতে একটা মৌলিক সংকট আছে; যা আমরা অসচেতনভাবে উপেক্ষা করছি। বিশেষ করে ইসলামি সাহিত্যে এই সংকটটি প্রকট। নন-ফিকশন ইসলামি সাহিত্যে লেখক-প্রকাশকরা বরাবরই উচ্চমার্গের বুদ্ধিবৃত্তিক লেখালেখিকে ধারণ করেন। সমাজের উচ্চশিক্ষিত এলিট শ্রেণিকে টার্গেট করে লেখকগণ সাহিত্য রচনা করেন। প্রকাশকরাও এই চিন্তা-কাঠামোর মধ্যেই আবদ্ধ থাকেন। খেয়াল করে দেখুন, ইসলামি সাহিত্যে এ পর্যন্ত যা কিছু প্রকাশিত হয়েছে, তার অধিকাংশই এই বিশেষ শ্রেণির পাঠকদের লক্ষ্য করে নির্মিত। সকল শ্রেণি-পেশার পাঠকদের বোধগম্য ভাষায় আমরা ইসলামি সাহিত্য তৈরি করতে ব্যর্থ হচ্ছি। সমাজের এই বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর কাছে ইসলামের বুনয়াদি শিক্ষাকে যতটা সহজ ও প্রাণবন্ত করে উপস্থাপন করা জরুরি ছিল, বাস্তবে তা আমরা পারিনি।

প্রায়শই বলি, ইসলামি সাহিত্য তথ্য-জ্ঞানে ভরপুর; কিন্তু এর উপস্থাপনা খুবই প্রথাগত, নিরস ও অগোছালো। উপস্থাপনার গলদে ইসলামি সাহিত্য অধ্যয়নে পরিতৃপ্তি আসে না। ইসলামের প্রাণসত্তার পাঠ যত বেশি জীবনঘনিষ্ঠ করা যাবে, পাঠকগণ তত বেশি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন এবং নিজের জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে পারবেন। ইসলামি জীবনব্যবস্থা নিঃসন্দেহে জীবন সমস্যার অনুপম সমাধান; তাই এর উপস্থাপনাও যথাসম্ভব জীবনমুখী হওয়া উচিত।

বাংলা ইসলামি সাহিত্যের অন্যতম জনপ্রিয় লেখিকা মুহতারামা মাসুদা সুলতানা রুমী এই সংকট মোকাবিলায় সচেতনভাবেই কলম হাতে তুলে নিয়েছেন। জীবনঘনিষ্ঠ কথামালাকে অনুপম ভাষায় জীবনের রং মেখে দিয়েছেন। লেখিকার বই পড়ে পাঠক অনুভব করতে পারেন, এ তো তারই জীবনের গল্প! সহজ কথাকে সহজে বলার অসাধারণ গুণ সবার থাকে না। আলহামদুলিল্লাহ, রুমী আপা সেই গুণে গুণান্বিত। ইতোমধ্যেই তিনি সব শ্রেণি-পেশার পাঠকদের হৃদয়ে বিশ্বাসী লেখিকা হিসেবে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছেন।

লেখিকার বেশকিছু জনপ্রিয় ছোটো ছোটো পুস্তিকার সমন্বিত উপস্থাপনাই হলো এই বাতিঘর গ্রন্থটি। গার্ডিয়ান পাবলিকেশন বাংলাভাষী পাঠকদের কাছে এই দারুণ গ্রন্থখানি তুলে দিতে পেরে গর্বিত ও উচ্ছ্বসিত। আমরা সম্মানিতা লেখিকার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। এই বইটির সম্পাদনা প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। আমরা বইটিকে যথাসম্ভব ত্রুটিমুক্ত করার চেষ্টা করেছি, এরপরেও সীমাবদ্ধ জ্ঞানের ব্যাপারে আমরা নিজেরা পূর্ণ ওয়াকিফহাল। কোনো ত্রুটি চোখে পড়লে ইসলামি সাহিত্য এবং জ্ঞান দুনিয়ার বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন বলে আশা করছি।

জীবনঘনিষ্ঠ এই বই সম্মানিত পাঠকদের মন ছুঁয়ে দেবে ইনশাআল্লাহ।

নুর মোহাম্মাদ আবু তাহের

বাংলাবাজার, ঢাকা।

১০ আগস্ট, ২০১৮

লেখিকার কথা

আমার লেখালেখি জীবনের শুরুতে ইসলামি দাওয়াহর একজন মুরব্বি বললেন, ‘রুমী, তুমি বই লিখলে চেষ্টা করবে ৩৫-৪০ পৃষ্ঠার ভেতর শেষ করতে। এতে তোমার চিন্তা-ভাবনা একেবারে তৃণমূল পর্যন্ত ছড়িয়ে যাবে। বেশি দামের মোটা বই কেনার মতো পাঠকের সংখ্যা খুবই কম। আমাদের উদ্দেশ্য মোটা মোটা বই লেখা নয়; বরং আদর্শ ও চিন্তাকে সর্বত্র ছড়িয়ে দেওয়া।’ তখন থেকেই আমার ভেতরে অন্যরকম একটা অভ্যাসের সৃষ্টি হলো। লেখা শুরু করলেই ৩০-৩৫ পৃষ্ঠার ভেতরে সমাপ্তি চলে আসতে লাগল। এভাবেই বাজারে চলে আসে ছোটো ছোটো আকারে বেশ কিছু বই। পাঠকদের মধ্যে বইগুলো নিয়ে যখন উচ্ছ্বাসের আমেজ দেখি, তখন ভীষণ ভালো লাগে। ইসলামি সাহিত্যঙ্গনের এই বিশাল জগতে ক্ষুদ্র মানুষ হয়েও একটু জায়গা পেয়েছি, ভাবতেই চোখ দুটো ভিজে ওঠে।

বাংলা ভাষায় ইসলামি সাহিত্য নিয়ে বেশকিছু কাজ হয়েছে, হচ্ছে। এটা খুশির ব্যাপার। একইসঙ্গে উদ্বেগের ব্যাপার হলো, অধিকাংশ ইসলামি সাহিত্যের ভাষাঅলংকার, শব্দচয়ন, বাক্যগঠন খুবই উচ্চমার্গের; যা সব শ্রেণি-পেশার পাঠকদের বোধগম্য হয়ে উঠে না। জীবনঘনিষ্ঠ সহজ ভাষায় ইসলামি সাহিত্য খুব কমই দৃশ্যমান। স্বপ্ন দেখেছি, বাংলাভাষী পাঠকবৃন্দের কাছে সহজবোধ্য ভাষায় জীবনবোধের কথাগুলো তুলে ধরার। কতটুকু পেরেছি জানি না; তবে সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা ও আন্তরিকতার কোনো কমতি ছিল না।

দেশব্যাপী তুমুল আলোড়ন সৃষ্টিকারী প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান গার্ডিয়ান পাবলিকেশন-এর তরুণ প্রকাশক স্নেহের নূর মোহাম্মাদ আবু তাহের আমার বইগুলো নিয়ে একটি সংকলন প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। এটা আমার জন্য অনেক সম্মানের। ছোটো ছোটো কথামালাকে একই বইয়ের মোড়কে দেখতে পাওয়া দারুণ আনন্দের ব্যাপার।

বাতিঘর নামের সংকলিত গ্রন্থটিকে নতুন আঙ্গিকে পাঠকদের হাতে তুলে দিতে গার্ডিয়ান পাবলিকেশন দারুণ পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। দীর্ঘ সময় নিয়ে বইটির সম্পাদনা করা হয়েছে, ভাষায় সাহিত্যিক লালিত্য সন্নিবেশিত হয়েছে। নতুন বানান রীতিতে যথাসম্ভব ভুলত্রুটি এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। গার্ডিয়ান পরিবারকে অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি, দুআ করছি।

বইটির সকল দায় আমার। যা কিছু ভালো হয়েছে, তার জন্য রাব্বুল আলামিনের কাছে উত্তম বিনিময় কামনা করছি। আর ভুলত্রুটি ও সীমাবদ্ধতার দায়ভার তুলে নিচ্ছি নিজের কাঁধে। সম্মানিত পাঠকদের চোখে কোনো ত্রুটি ধরা পড়লে আমাকে অথবা প্রকাশককে জানালে কৃতজ্ঞ থাকব। নিখুঁত জ্ঞানের প্রশ্নে আমাকে অবশ্যই বিনয়ী হিসেবে পাবেন ইনশাআল্লাহ।

বাতিঘর ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি পরিবারে; আলোকিত হোক জান্নাতের পবিত্র রওশনিতে।

মাসুদা সুলতানা রুমী

নওগা

সূচিপত্র

ভালোবাসা পেতে হলে	
ভালোবাসা কীভাবে পাওয়া যাবে	১৩
ভালোবাসার তদবির	২০
ভেঙে গেল সংসার	২১
মেয়েদের পছন্দের মূল্য	২৩
এই দেশের এক জামিলা	২৫
আজকের প্রয়োজন, আগামীকালের অপ্রয়োজন	২৬
সম্পদের জন্য চরম অন্যায় করা	২৯
ব্যতিক্রমও আছে	৩০
বোনদের সব সম্পত্তি এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া	৩২
জালিমকে সহযোগিতা করা	৩৩
আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনড় থাকা	৩৪
এই জামানার উম্মে সুলাইম	৩৫
ভালোবাসার কান্না	৪০
শাশুড়ি-বধূর ভালোবাসার অভাব	৪২
নারী-পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক	
সমাজ সংগঠন	৪৯
নারী-পুরুষের সম্পর্ক	৫০
নারীর সামাজিক অবস্থান নিয়ে মতবিরোধ	৫১
ইসলামি আইনের ভারসাম্য নীতি	৫৫
স্ত্রীর কাছে স্বামীর আনুগত্য দাবির সীমা	৫৭
আখিরাতের সফলতাই আসল সফলতা	৫৯
নারীদের বিষয়ে আরও কিছু কথা	৬২
হুঁর গিলমান	৬৩
কার মূল্য বেশি	৬৪
চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা	৭৪
মানুষ কত অসহায়	৭৫
দ্বীনদারি ও দুনিয়াদারি	৭৬
দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ	৭৭

ভালোবাসা কি দিবস নির্ভর	
ভ্যালেনটাইনস ডে কী	৮০
খ্রিষ্ট সমাজে বিয়ে করা কেন অপরাধ	৮২
একটি প্রতিবাদ	৮২
প্যারেন্টস ডে	৮৩
বিবাহ সম্পর্কে ইসলামের বিধান	৮৪
মা-বাবা সম্পর্কে ইসলামের বিধান	৮৫
মৃত্যুর পরও তাদের হক আদায় করার নির্দেশ	৮৭
ভালোবাসা দিবস	৮৭
প্রাচীন জাহেলিয়াত	৮৯
নতুন জাহেলিয়াতের আগমন	৯০
বিজাতীয় অনুকরণ	৯১
দাইউস কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না	
পর্দা করার নির্দেশ	৯৭
পুরুষের পর্দা	৯৮
নিজেদের ব্যাপারে উদাসীন	৯৯
পর্দা না করার পরিণতি	১০১
একটি দরজা খোলা	১০১
পর্দা করা কোনো কঠিন কাজ নয়	১০২
দুনিয়াই আখিরাতের শম্যক্ষেত্র	১০২
বিধর্মীদের মতো দেখতে	১০২
কঠিন শাস্তি	১০৩
ইবলিসের ধোঁকা	১০৬
প্রচণ্ড গরমে হিজাব	১০৭
ইবাদাতের মজা	১০৭
অনিচ্ছায় পর্দা আর ইচ্ছায় পর্দা	১০৮
আল-কুরআনের সবটুকুই মানতে হবে	১০৯
আল-কুরআনে পর্দা	১১০
আল-হাদিসে পর্দা	১১২

আল্লাহর রঙে রঙিন হব	
আর এক শ্রেণির মুসলমান	১১৮
আল-কুরআন একটি ব্যবহারিক গ্রন্থ	১১৮
ইসলামবিরোধী নামাজি	১২১
নামাজি মুশরিক	১২২
ইসলামকে সঠিকভাবে জানতে হবে	১২৮
শুদ্ধ তিলাওয়াত	১৩১
হতে হবে আল্লাহর রঙে রঙিন	১৩২
সংসার সুখের হয় পুরুষের গুণে	
সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে	১৩৩
আমার দেখা সংসারের সুখ-দুঃখ	১৩৪
সুখের সংসার	১৩৬
সুখী সংসার গঠনে পুরুষের দায়িত্ব	১৩৬
নিজেদের দায়িত্ব সম্পর্কে উদাসীন	১৩৯
নারীদের ওপর নির্যাতনের বেশ কয়েকটি কারণ	১৪৪
অশান্তি সৃষ্টিতে মেয়েদের ভ্রূটি	১৫৬
মেয়েদের ভালোবাসা	১৬২
মেয়েদের ত্যাগ	১৬৩
আমি বারো মাস তোমায় ভালোবাসি	
আমি তোমাকেই ভালোবাসি	১৬৫
ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার	১৬৬
আল্লাহকে ভালোবাসার নিদর্শন	১৬৯
রাসূলের প্রতি ভালোবাসা	১৬৯
ভালোবাসার প্রমাণ	১৭৪
ভালোবাসার পরীক্ষা	১৭৭
ইবলিসের ধোঁকা	১৭৮
নফল ইবাদাত	১৮০
নফল নামাজ	১৮২
বারো মাসের নফল ইবাদাত	১৮৩

বিদয়াতের বেড়াজালে ইবাদাত

ইবাদাত কী	১৯১
ইবাদাতের সহজ সংজ্ঞা	১৯২
ইবাদাত না করার পরিণতি	১৯৩
বিদয়াতের পরিচয়	১৯৩
যেভাবে বিদয়াতের সৃষ্টি	১৯৫
বিদয়াতের কুফল ও পরিণতি	১৯৭
প্রচলিত কতিপয় বিদয়াত, কুসংস্কার ও কুপ্রথা	১৯৯

নেক আমল বিধ্বংসী বদ আমলসমূহ

নামাজে অবহেলা করা	২৩৮
বিনা ওজরে জামায়াত ত্যাগ	২৪১
জাকাত না দেওয়া	২৪২
ওশর না দেওয়া	২৪৪
বিনা ওজরে রমজানের রোজা ভঙ্গ	২৪৫
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হজ না করা	২৪৭
পিতা-মাতার অবাধ্য	২৪৮
ইয়াতিমের মাল আত্মসাৎ	২৫১
গর্ব বা অহংকার	২৫৩
মিথ্যা কথা বলা	২৫৬
সবচেয়ে বড়ো মিথ্যা	২৫৭
মিথ্যা বলা কখন জায়েজ	২৫৮
মিথ্যা সাক্ষ্য	২৫৯
মিথ্যা শপথ	২৬০
আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছু নামে কসম	২৬১
মদ্যপান	২৬২
তাহলিল বা হিলা বিবাহ	২৬৩
দুর্বল শ্রেণির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার	২৬৪
সৎ ও আল্লাহভীরু বান্দাদের কষ্ট দেওয়া	২৬৫
ভবিষ্যৎ বক্তা বা গণকের কথা বিশ্বাস	২৬৬
পুরুষের স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার	২৬৭
জুয়া খেলা	২৬৭
ওয়ারিসকে ঠকানো	২৬৮

ভালোবাসা পেতে হলে

ভালোবাসা কীভাবে পাওয়া যাবে

‘তোমাকে বিয়ে দিয়েছি, বিক্রি তো করিনি। সবার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করবে, মানিয়ে চলার চেষ্টা করবে। তবে একান্তই কেউ যদি তোমাকে বুঝতে না চায়, তাহলে ডোন্ট কেয়ার; তোমাকে জীবনবাজি রেখে সংসার করতে হবে না। যদিও দাম্পত্য জীবনের সুখ-শান্তি নির্ভর করে ত্যাগ ও আপসের ওপর।’

কথাগুলো বলেছিলেন আমার বাবা। যখনই কারও বিয়ের কথা শুনি কিংবা বিয়ের দাওয়াত পাই, তখনই বাবার এই কথাগুলো মনে পড়ে যায়। ১৯৭৯ সালের ১৬ জানুয়ারি এসব তিনি আমাকে বলেছিলেন। আমার বিয়ের ঠিক পরের দিন।

কথাগুলো আবার যেভাবে বলেছিলেন, ঠিক সেভাবেই আমার জীবনসঙ্গীকে বলেছিলাম। সে হাসি মুখে, খুশি মনে বলেছিল, ‘ঠিক আছে, চলো সেভাবেই চলি।’

আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সেভাবেই চলেছি। এত বছর একসঙ্গে চলেছি, কারও বিরুদ্ধে আমাদের কোনো নালিশ ছিল না। পরস্পরের প্রতি আমরা শ্রদ্ধাশীল। ভালোবাসায় পরিপূর্ণ আমাদের সংসার। আর এই ভালোবাসা সংক্রমিত হয়েছে আমাদের সন্তানদের মধ্যে, পরিবারের অন্য সদস্যদের মধ্যে। এই ত্যাগ ও আপস (Sacrifice & Compromise) শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয়; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই একান্ত প্রয়োজন। জীবন চলার পথে পরস্পরের প্রতি যত অসন্তোষ, যত অভিযোগ, তার প্রায় সবটাই এ দুটো জিনিসের অভাব থেকেই জন্ম নেয়। আমাদের নিজেদের সুখ-শান্তি এবং স্বার্থেই এ দুটো গুণ অর্জন করা দরকার। আর এই গুণটিকেই কুরআনের পরিভাষায় বলা হয় ‘ইহসান’। এটি এমন এক সর্বোত্তম গুণ; যা একজন মুসলিমকে পরিপূর্ণ মুসলিম হিসেবে স্বীকৃতি দেয়, একজন পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে।

আল্লাহ তায়ালা আমাদের দুআ শিখিয়েছেন—

‘রাব্বানা আত্ফিনা ফিদ্বুনইয়া হাসানাতাও ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাহ, ওয়া ফিনা আজাবান্নার- হে আমাদের রব, আমাদের দুনিয়ায় শান্তি দাও এবং আখিরাতেও শান্তি দাও। আর জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো।’ সূরা আল বাকারা : ২০১

এ দুনিয়ার শান্তি সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করে এই ত্যাগ ও আপস (Sacrifice & Compromise)-এর ওপর। আর যে ব্যক্তি দুনিয়ায় শান্তি পাবে, সে আখিরাতেও শান্তি পাবে এবং জাহান্নামের আগুন থেকে নিষ্কৃতি পাবে। কারণ, দুনিয়ায় শান্তি পেতে হলে যে আমলগুলো করতে হয়, সেগুলো সম্পাদন করা আল্লাহ তায়ালারই নির্দেশ; যার মাধ্যমে সে জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি পাবে। আর আখিরাতে পাবে পরিপূর্ণ শান্তি।

একবার রাসূল ﷺ বললেন,

‘এক্ষুনি একজন জান্নাতি লোক আসবে! উপস্থিত সকল সাহাবি অপেক্ষায় থাকলেন, কে আসে তা দেখার জন্য। একটু পরেই এক ব্যক্তি এলেন, যাকে সবাই চেনেন। এভাবে পরপর তিন দিন রাসূল ﷺ ঘোষণা দিলেন, একটু পরেই একজন জান্নাতি লোক আসবে। আর এই তিন দিনই সেই একই ব্যক্তি এলেন। এই জান্নাতের ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তি কী এমন আমল করেন, তা জানার জন্য এক তরুণ সাহাবির মনে খুব কৌতূহল সৃষ্টি হলো। তিনি তখন সেই সাহাবির পাশ ঘেঁষতে লাগলেন। তিন দিন, তিন রাত তাঁর সাহচর্যে থাকার পরও এমন কোনো বিশেষ আমল তিনি ওই ব্যক্তির মধ্যে খুঁজে পেলেন না, যা তাঁদের থেকে ওই ব্যক্তিকে আলাদা মর্যাদা এনে দিয়েছে। অতঃপর কৌতূহলী সাহাবি ঘোষণাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে সব জানালেন এবং তাঁর আমল সম্পর্কে জানতে চাইলেন। জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত ব্যক্তি জানালেন, “অন্যান্য কাজ তোমরা যা করো, আমি তার চেয়ে বেশি কিছু করি না। কিন্তু আমার দিন-রাত, সকাল-সন্ধ্যা অতিবাহিত হয় এমনভাবে যে, কারও ওপর আমার কোনো অভিযোগ নেই।” কৌতূহলী সাহাবি বললেন, “তাহলে এই আমলই আপনাকে জান্নাতে পৌঁছে দিয়েছে।” সহিহ বুখারি ও মুসলিম

এই যে আমল, এরই নাম ত্যাগ (Sacrifice)। আমাদের যাপিত জীবনে যত অসন্তোষ আর অশান্তির সৃষ্টি হয়, তা সবসময় বড়ো কোনো বিষয় নিয়ে নয়; বরং ছোটো ছোটো ব্যাপারে ছাড় দিতে না পারার কারণে। দুনিয়াতেই আমরা শান্তি জোগাড় করতে পারি না; তাহলে আখিরাতে কী করে শান্তি হাসিল করব? পরিপূর্ণ মুসলিম হতে হলে ঈমান, ইলম ও আমলের সঙ্গে আমাদের আরও তিনটি গুণ থাকা একান্ত প্রয়োজন। ছাড় দেওয়ার মনোভাব, সমঝোতার মনোভাব, পারস্পরিক ভালোবাসা। ব্যাস, এই তিনটি গুণই যথেষ্ট! যদিও তৃতীয় গুণটি থেকেই অপর দুটো গুণের উৎপত্তি। মূল কথা হলো, ভালোবাসাই ইসলাম। ভালোবাসার মাঝেই আছে শান্তি, সম্মান। আখিরাতে মুক্তি ও জান্নাত। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘তোমরা ততক্ষণ জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে।’ সহিহ বুখারি

অতএব, পারস্পরিক ভালোবাসা হলো মুমিন হওয়ার পূর্বশর্ত। আর এই ভালোবাসা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির জন্য রাসূল ﷺ দুটো আমল করতে বলেছেন—

‘অধিক পরিমাণে সালামের প্রচলন করো এবং যাকে ভালোবাসো, তাকে ভালোবাসার কথাটি জানাও।’ মেশকাত শরিফ

এই ভালোবাসার কথাটা জানানো যে কতটা জরুরি, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। ঈমানের যেমন তিনটি পর্যায়; অন্তরে বিশ্বাস রাখা, মুখে স্বীকার করা, আর কাজে তার প্রমাণ দেওয়া।

ভালোবাসা ঈমানেরই আরেক নাম। ভালোবাসা অন্তরে জাগতে হবে, মুখে স্বীকার করতে হবে এবং তারপর তা কাজে প্রমাণ দিতে হবে। তাই তো ঈমান আনতে হলে মুখে কালেমা শাহাদাত উচ্চারণ করতে হয়। মুখে উচ্চারণ না করলে তার ঈমান গ্রহণ করাই হয় না। তাই ভালোবাসার কালেমাও মুখে উচ্চারণ করা জরুরি। আর ভালোবাসা এমন এক মূলধন, যা মুখে উচ্চারণের মাধ্যমে বিলি করলে লাভসহ ফিরে আসবেই। এমন অনেক পরিবার আছে যাদের মধ্যে ভালোবাসার খুবই অভাব। এমন অনেক দম্পতি পাওয়া যায়, ৩০-৪০ বছর সংসার করার পরও তারা ভালোবাসার নাগাল পায়নি। তাহলে কীভাবে, কী করে তাদের ছাড় দেওয়ার মনোভাব আসবে? আর সমঝোতার তো প্রশ্নই আসে না।

একবার এক দাওয়াতি মাহফিলে বক্তব্য শেষে সবাইকে উদ্দেশ্য করে বললাম, কারও কোনো প্রশ্ন থাকলে করতে পারেন। এক বয়স্ক মহিলা বললেন, ‘আপা, আমার স্বামী মারা গেছে এক বছর হলো। তার জন্য তো আমার দুআ করা উচিত। কিন্তু আমার মন থেকে যে দুআ আসে না। আমি এখন কী করব?’

বুঝতে না পেরে আমি জিজ্ঞেস করলাম, ‘দুআ আসে না মানে কী?’

মহিলা বললেন, ‘আমার স্বামী এমন কোনো খারাপ কাজ নেই, যা সে করেনি। মদ, জুয়া, এমনকী খারাপ মেয়েদের কাছে যাওয়াও বাদ দেয়নি। এখন দুআর জন্য হাত তুলে ‘আল্লাহ তাকে ভালো রেখো কিংবা মাফ করে দাও’ এ কথা বলতে পারি না। শুধু মুখে আসে, এখন মজা বোঝো! দুনিয়াতে থাকতে তো আমার কথা বিশ্বাস হয়নি। আপা, আমি জানি তার জন্য ভালো দুআ করা উচিত, কিন্তু দুআ যে আমার অন্তর থেকে আসে না।’

একটু চুপ থেকে বললাম, ‘আচ্ছা আপনার স্বামী কেমন খারাপ ছিল বলেন তো? কোনো বেগানা পুরুষকে আপনার ঘরে ঢুকে দিয়ে তাকে নিয়ে রাত কাটাতে বলেছে?’

মহিলা আঁতকে উঠলেন, ‘ছি! ছি! কী বলছেন আপা! না না, ওসব করেনি; বরং আমাকে কোনো পুরুষের সঙ্গে কথাটা পর্যন্ত বলতে দিত না। আমি একটু জোরে কথা বললে আমাকে বকাঝকা করত।’

আবার বললাম, ‘আপনাকে নামাজ পড়তে নিষেধ করেছে?’

মহিলা বললেন, ‘না আপা। সে আমাকে নামাজ পড়তে কোনোদিন নিষেধ করেনি; বরং কোনো কোনো দিন আমার নামাজ পড়তে একটু দেরি হলেই রাগ করে বকাঝকা করত।’

বললাম, ‘আপনার খাওয়া-পরা কীভাবে চলে? থাকেন কোথায়?’

মহিলা বললেন, ‘খাকি স্বামীর বাড়িতেই। জমি-জমা আর খেত-খামারও আছে। ফল-ফসল ভালোই পাই। তা ছাড়া আমার স্বামী সরকারি চাকরি করত। আড়াই হাজার টাকা পেনশন পাই। আল্লাহর রহমতে থাকা-খাওয়ার অসুবিধা নেই।’

বললাম, ‘তাহলে ভাবেন তো! স্বামীর বাড়িতে থাকেন, তার জমির ফল-ফসল খান, তার চাকরির পেনশন ভোগ করেন; তার ওপর সে আপনার এতটুকু ক্ষতিও করেনি। দুনিয়ারও না, আখিরাতেরও না। সে যা করেছে, তা শুধু তার নিজের সর্বনাশ! সে নিজের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে। তার জন্য তো আরও বেশি করে দুআ করবেন। বলবেন, “হে আল্লাহ! এই মানুষটাকে তুমি মাফ করো। সে আমার বড়ো উপকার করেছে। এখনো তার শ্রমের ফল আমি ভোগ করি, খাই-পরি।’

সে না বুঝে নিজের সর্বনাশ করেছে। নিজের ওপর জুলুম করেছে। তাকে তুমি মাফ করো, মালিক।” তার কিছু ভালো কাজ থাকলে সে কথা উল্লেখ করে আল্লাহর কাছে দুআ করুন। তার বাড়িতে আছেন। তার জমির ফসল খান। তার শ্রমের বেতন এখনো ভোগ করেন, আর তার জন্য দুআ না করলে আপনার মতো বেঈমান তো আর দেখি না!’

মহিলা এবার ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

অনেকদিন পরে সেই মহিলার সঙ্গে আবার দেখা হলো। বললাম, ‘স্বামীর জন্য কি অন্তরে দুআ আসে?’

‘জি আপা আসে। আপনি ঠিকই বলেছেন, মানুষটা আমার সঙ্গে কোনোদিন খারাপ ব্যবহার করেনি। যা করেছে তা শুধু নিজেরই সর্বনাশ করেছে। আল্লাহ যেন তাকে মাফ করে দেন। আপনি বলার আগে তার ওপর আমার কোনো ভালোবাসাই ছিল না। আপা, এখন মানুষটার ওপর আমার কী যে মহব্বত পয়দা হয়েছে! সবসময় মনে হয় মহান আল্লাহ যদি তার সব গুনাহ মাফ করে দিতেন! আমি আল্লাহ পাকের কাছে এখন শুধু এই দুআই করি, তিনি যেন মানুষটিকে মাফ করে দেন।’

এমনিভাবে যদি জীবিত বা মৃত সবার প্রতি আমাদের মহব্বত সৃষ্টি হতো, তাহলে আমরা মন থেকে সবাইকে মাফ করতে পারতাম। ছাড় দিতে পারতাম। সমঝোতায় আসতে পারতাম। তাহলে দুনিয়ায় শান্তিতে থাকতে পারতাম। তবে স্মরণ রাখতে হবে, সবকিছু যেন হয় আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। কারণ, আমার নামাজ, আমার কুরবানি, আমার জীবন, আমার মরণ, সবই তো মহান রবের জন্য। তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘যেদিন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত আর কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন ওই ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়ায় জায়গা দেবেন, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আল্লাহর দ্বীনের জন্যই পরস্পরকে ভালোবেসেছিল। সহিহ মুসলিম

১৯৮৯ সাল পর্যন্ত নওগাঁ জেলায় মহিলাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করার মতো কেউ ছিল না। ১৯৮৯ সালের ডিসেম্বরের দিকে আমি আর একজন বোন দাওয়াতি কাজ শুরু করি। তার কয়েকদিন পরেই ৩০ ডিসেম্বর মনে হয় রওশন আরা আপা আসেন। এরপর ১৯৯৩-৯৪ সালের মধ্যে ১৩-১৪ জন হয়ে যায়। বর্তমানে জেলায় মহিলাদের মাঝে দাওয়াতি কাজ করছেন প্রায় ৪৪-৪৫ জন। যাহোক, সেই ১৩-১৪ জন সক্রিয় দাওয়াতি কাজ করা বোনের মধ্যে রওশন আরা আপার সঙ্গে আমার খাতিরটা যেন একটু বেশিই ছিল! আমি তখন থাকতাম সাপাহার উপজেলায়। নওগাঁ জেলা শহর থেকে অনেক দূরে। ত্রৈমাসিক মাহফিলে নওগাঁ আসতাম।

রওশন আরার বাসায় অবশ্যই একবার যেতাম। আর রওশন আরাও আমাকে খুব ভালোবাসত। একবার মাহফিলে গিয়ে দেখি রওশন আরা আসেনি। মনটা খারাপ হয়ে গেল। আসেনি কেন? নওগাঁর আরেক আপাকে জিজ্ঞেস করলাম। সেই আপা বললেন, ‘রওশন আরা আর আগের মতো নেই। সে কোনো মাহফিলে আসে না। সাপ্তাহিক মাহফিলেও ঠিকমতো হাজির হয় না।’

একটু পরেই দেখি রওশন আরা আপা এসেছেন। আমি খুশি হয়ে গেলাম। সালাম বিনিময়ের পর ওনার হাত ধরে বললাম, ‘এত দেরি করলেন কেন আপা? বাসায় কোনো সমস্যা?’

‘সমস্যা তো আছেই। আমি এখানে দেরি করতে পারব না! শুধু আপনার সঙ্গে দেখা করতে এলাম। আপনি চলে যাওয়ার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে যাবেন।’

বললাম, ‘একটু দেরি করেন, কুরআনের দারসটা শুনে যান।’

‘না না, আমার সময় নেই।’ বলেই চলে গেলেন রওশন আরা।

সম্মেলন শেষে একজন দ্বিনি ভাই পর্দার আড়াল থেকে আমাকে বললেন, ‘রুমী আপা, আপনি একটু রওশন আরার সঙ্গে কথা বলুন। রওশন আরা মনে হয় ইসলামের মূল স্পিরিট থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।’

আমি রওশন আরা আপার বাসায় গেলাম। তিনি আমাকে দেখে খুব খুশি হলেন। বিভিন্ন কথা বলতে লাগলেন। ভালো আপ্যায়নের ব্যবস্থা করলেন। আমি বললাম, ‘আপা, আপনি দাওয়াতি কাজ থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন মনে হয়।’

রওশন আরা আপা বললেন, ‘আপা, দাওয়াতি কাজ করতে গিয়ে আমি অনেক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছি।’

বললাম, ‘যেমন?’

‘যেমন, আমার ছেলেমেয়েদের প্রতি সঠিক যত্ন নিতে পারি না। পড়াশোনার খোঁজখবর নিতে পারি না। ওদের রেজাল্ট ভালো হচ্ছে না।’

বললাম, ‘ঠিক আছে, কাজ কম করুন। একদম ছেড়ে দেবেন না। অন্তত একজন মুসলিম হিসেবে হক আদায় করুন। আপনার নিজের এলাকা ঠিক রাখুন আর শুধু মাহফিলে হাজির থাকবেন।’

আবার তিন মাস পরে গিয়ে শুনি রওশন আরা আপা একদম সরে গেছেন। আমি ওনার বাসায় আবার গেলাম। দাওয়াতি কাজের খোঁজখবর নিতেই বললেন, ‘ও সব বাদ দেন তো আপা। দুলাভাই কেমন আছেন, তাই বলুন।’

ওর কথায় আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। বললাম, ‘দুলাভাইকে দিয়ে তো আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক নয়! সম্পর্ক ইসলাম দিয়ে। ইসলামের কথাই যদি বাদ দিই, তো আপনার সঙ্গে সম্পর্কের আর থাকে কী?’

কষ্ট পেলেন রওশন আরা আপা। আহত কণ্ঠে বললেন, ‘শুধুই ইসলামের জন্য আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক? আর কোনো সম্পর্ক নেই?’

বললাম, ‘আপা! ২৫ বছর সংসার করার পর কোনো স্বামী যদি স্ত্রীকে তালাক দেয় আর বলে, “তালাক দিয়েছি তো কী হয়েছে? এতদিন একসঙ্গে ছিলাম, এখনো থাকব। তোমার সঙ্গে কি আমার কোনো সম্পর্ক নেই?” তখন কেমন লাগবে? তালাকের পরে স্বামী-স্ত্রীর আর কোনো সম্পর্ক থাকে? থাকে না আপা। কারণ, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্ক হয়েছিল বিয়ের মাধ্যমে। সেই বিয়েই যদি ভেঙে যায়, তাহলে সম্পর্ক কীভাবে থাকবে? আপনার সঙ্গে আমার সম্পর্ক হয়েছে ইসলামের দাওয়াতি কাজের মাধ্যমে। সেই মাধ্যমই যদি আপনি ছিন্ন করে ফেলেন, তো সম্পর্ক থাকবে কীভাবে?’

‘আপা! আপনাকে আমি খুব ভালোবাসি, আমাকে আপনি দূরে সরিয়ে দেবেন না।’ করুণভাবে বলল রওশন আরা আপা।

রওশন আরা আপার সঙ্গে সেই আমার শেষ দেখা। শুধু ইসলামের প্রাণসত্তা থেকেই নয়, রওশন আরা ধীরে ধীরে ইসলামের মৌলিক অনুশীলন থেকেও সরে গেল। যে সন্তানের লেখাপড়ার জন্য রওশন আরা দাওয়াহ ছাড়ল, তাদের পরবর্তী পরিণতির কথা মনে উঠলে ভয়ে আঁতকে উঠি!

ওনার মেয়েটা এক বখাটে ছেলের সঙ্গে পালিয়ে বিয়ে করে চলে গেছে। আর ছেলেটা পরপর তিনবার এসএসসি ফেল করে আত্মহত্যা করেছে। রওশন আরা আপার এ পরিণতি আমি কখনও চাইনি। আল্লাহর কাছে বারবার পানাহ চাই। মাঝেমাঝে শুনি কোনো কোনো বোন ইসলামের কাজে সন্তানের অজুহাত তোলেন। আমার তখনই মনে পড়ে রওশন আরা আপার কথা। ভয়ে শিউরে উঠি! রওশন আরা আপার জন্য এখনো হৃদয়ের মধ্যে একটা ব্যথা চিনচিন করে ওঠে। ভেতরে ভেতরে অস্থিরতা অনুভব করি। দুচোখ দিয়ে পানি ঝরে অবোরে।

তবে মাঝে মাঝে এই কষ্টের মধ্যেও খুশি হই এই ভেবে, ‘হে আল্লাহ! আমি আমার ভালোবাসার প্রমাণ দিয়েছি। রওশন আরা আপাকে ভালোবেসেছিলাম তোমার জন্য, বিচ্ছিন্নও হয়েছি তোমার জন্য। তুমি আমার প্রতি রাজি থেকো।’

ভালোবাসার তদবির

একবার আমার কাছে এক নববিবাহিতা এলো। স্বামী তাকে ভালোবাসে না, এই অনুযোগ জানাতে। অনুরোধের সুরে বলল, ‘আপা, আপনি তো কুরআন-হাদিস অনেক পড়েছেন। স্বামী আমাকে একদম পছন্দ করে না। কোনো তাবিজ কিংবা তদবির দিতে পারেন?’

মেয়েটির করুণ অসহায় মুখটি দেখে খারাপ লাগল। কী মিষ্টি মেয়ে, অথচ কতটা মানসিক যন্ত্রণায় দিন পার করেছে! এ যন্ত্রণা আমার নারী মনকেও ছুঁয়ে দিলো।

মেয়েটির সঙ্গে অনেক কথাবার্তা শেষে বললাম, ‘তাবিজ নয়, তোমাকে একটা তদবির দিতে পারি।’

মেয়েটি খুশি হয়ে বলল, ‘তাই দিন আপা।’

বললাম, ‘দুটো দুআ পড়বে তুমি।’

‘কী দুআ?’

‘একটা হলো, যখনই তোমার স্বামী বাইরে যাবে এবং বাড়িতে ফিরবে, তখনই তুমি হাসি মুখে তাকে সালাম দেবে। বলবে, “আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ”। আর দিনে অন্তত দুবার পরিবেশ বুঝে বলবে, “আমি তোমাকে ভালোবাসি”।’

“মেয়েটি তো হেসেই খুন! বলল, ‘সালামটা হয়তো কোনোমতে দিতে পারব, কিন্তু ওই কথা বলব কী করে! আমাকে খুন করে ফেললেও এটা বলতে পারব না।’ মেয়েটি হেসেই যাচ্ছে! হাসতে হাসতে সে একবার বিষম খেল।

একটু ভাবুন তো! এই মেয়েদের আমি কী বলব, যারা কিনা জাদুমন্ত্র দিয়ে স্বামীকে বশে আনতে চায়, কিন্তু স্বামীকে ভালোবাসতে চায় না!

তাকে বললাম, ‘এ কথা বলা সুনাত। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘যাকে ভালোবাসো, তাকে ভালোবাসার কথাটা জানাও।’ তিরমিজি : ২৩৯২

রাসূল ﷺ-এর এই শিক্ষা বিধর্মীরা মানে, অথচ আমরা মানা তো দূরের কথা, অনেকে জানিই না! আমরা যদি মা ছেলেকে, ছেলে মাকে, স্বামী স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, ভাই বোনকে, বোন ভাইকে, বাবা সন্তানকে, সন্তান বাবাকে, ভাই ভাইকে, বন্ধু বন্ধুকে অর্থাৎ সবাই সবাইকে ‘তোমাকে ভালোবাসি’ এই কথাটা বেশি বেশি করে বলতে পারতাম, তাহলে আমাদের পরিবার আর পরিবেশের চেহারা বদলে যেত! আমাদের এই সমাজে ভালোবাসার প্রচণ্ড ঘাটতি। সেইসঙ্গে ত্যাগ ও আপসের বড়ো অভাব।

কবি আবদুল হালিম খাঁর ভাষায় বলতে হয়, ‘আমাদের সবার বুকের গভীরে মৎস্য চাষের মতো ভালোবাসার চাষ করা প্রয়োজন।’

হজরত আনাস (রা.) বলেন—

‘আমি দশ বছর রাসূল ﷺ-এর খেদমত করেছি। তিনি কোনোদিন আমাকে বলেননি, এভাবে করলে কেন, ওভাবে করলে না কেন? কোনো খাদেম কিংবা খাদেমা সঠিকভাবে কাজ না করলে মালিক যদি কৈফিয়ত চাইতেন, তা রাসূল ﷺ শুনলে বলতেন, ছেড়ে দাও তো, পারলে তো করতই।’ সহিহ বুখারি ও মুসলিম

এই যে ‘ছেড়ে দাও’ কথাটা, এই যে মনোভাবটা, এরই নাম ত্যাগ (Sacrifice)। এই মনোভাবের বড়োই অভাব আমাদের সমাজে, পরিবারে। শুধু এর জন্যই যে কত সোনার সংসার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে!

ভেঙে গেল সংসার

আলম আর জেসমিনের সংসারটার কথাই ধরা যাক। শিক্ষা, সম্পদ, রূপ, গুণ, কী ছিল না? সোনার টুকরো চারটি সন্তান। সব থাকা সত্ত্বেও শুধু ত্যাগ ও আপসের অভাবে ভেঙে গেল সংসারটা। দুজনেই জেদের ওপর অটল ছিল। ওদের কি উচিত ছিল না, শুধু সন্তানদের মুখের দিকে তাকিয়ে নিজেদের মানিয়ে নেওয়া? একটা সমঝোতায় আসা?

আলম খুবই সুন্দর, সুঠাম, বলিষ্ঠ, শিক্ষিত, মার্জিত, ধার্মিক ও বুদ্ধিমান একজন পুরুষ। আর জেসমিন আলমের চেয়েও ধার্মিক, বুদ্ধিমতী ও অপরূপা সুন্দরী একজন মহিলা। চার সন্তান হওয়ার পরেও সৌন্দর্যের দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে থাকতে হয়। এক বিন্দু বয়সের ছোঁয়া লাগেনি চেহারায়।

দাম্পত্য জীবনের শুরু থেকেই কেউ কাউকে ছাড় দিতে চায়নি। তাই এরা কোনো দিনই সমঝোতায় আসতে পারেনি। আঠারো বছর একসঙ্গে থাকার পরেও এদের মধ্যে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়নি। দুজনই খুব স্বার্থপর। সন্তানের সুখ-শান্তি আর ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে অন্তত একসঙ্গে থাকতে পারত। আলম নির্লজ্জের মতো শুধু নিজের সুখের জন্য আরেকটা বিয়ে করল, আর জেসমিন চারটি সন্তান রেখেই চলে গেল বাপের বাড়িতে।

কী জানি সন্তানদের জন্য জেসমিনের কষ্ট হয় কি না! আলমের চেয়েও ধনী লোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হয়েছে। শুধু সন্তান চারটি মাহারা হয়েছে!

এখানে জেসমিন একটু ত্যাগ করলেই সংসারটা টিকে থাকত। আমার এই লেখায় অনেকেই মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। হয়তো বলবেন, আলম ত্যাগ করতে পারল না? শুধু মেয়েরাই ত্যাগ করবে কেন? হ্যাঁ, আলম অবশ্যই ছাড় দিতে পারতো; কিন্তু জেসমিনদের তো বাধ্য হতে হয় সন্তান রেখে চলে যেতে।

আলম-জেসমিন দুজনেই ঘর পেয়েছে, কিন্তু সন্তান চারটি নিজের ঘরে পর হয়ে গেছে। সৎমায়ের সংসারে পরজীবীর মতো বেঁচে আছে। বড়ো ছেলে মাদকাসক্ত আর পরের দুটো ছেলে অতি কষ্টে সৎমায়ের নির্যাতন সহ্য করেছে। আর মেয়েটি প্রতিবন্ধীর মতো বেড়ে উঠছে। আলম-জেসমিনের কেউ সাথিহারা হয়নি, কিন্তু সন্তান চারটি মাছাড়া হয়েছে, আর বাবা থেকেও নাই হয়ে গেছে।

সম্প্রতি টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরের নববিবাহিতা দুজন মেয়ের সঙ্গে পরিচিত হয়েছি। দুটো মেয়েই উচ্চ শিক্ষিত, চাকরিজীবী। একজনের নাম মমতা। মমতা অল্প দিনের মধ্যেই স্বশুর, শাশুড়ি, দেবর, ননদদের ভালোবাসা দিয়ে আপন করে নিয়েছে। মমতার শাশুড়ি বলে, আমি বুঝতে পারি না কাকে বেশি ভালোবাসি। আমার মেয়ে কবিতাকে, না আমার পুত্রবধূ মমতাকে! মমতার স্বামীর কথা আর কী বলব? আমার দৃঢ় বিশ্বাস, মমতার সংসারে কোনোদিন অশান্তি আসবে না, ইনশাআল্লাহ!

আর একজন শিউলি। শিউলি কলেজে চাকরি করে। শিউলির মায়ের আর কেউ নেই। তাই মায়ের কাছে থাকে। আর এই মায়ের কাছে থাকাটা শিউলির স্বশুর বাড়ির কেউ পছন্দ করে না, স্বামীও না। এই নিয়েই প্রথম অশান্তি। এই অশান্তি থেকে আরও অনেক অশান্তির জন্ম। শিউলি আর ওর স্বামী, যেকোনো একজন যদি ত্যাগ না করে, একটা সমঝোতায় আসতে না পারে, তাহলে এই সংসার টিকবে না।

এখন ওদের উচিত হবে, হয় নিজের স্বার্থ কিছু ত্যাগ করে সমঝোতার মাধ্যমে সংসার করা, নাহয় একটা সন্তান আসার আগেই পরস্পর আলাদা হয়ে যাওয়া। এভাবে ঝুলে থেকে দুজনের জীবনকেই দুর্বিষহ করে তোলার কোনো মানে নেই। এখানে ইসলাম ওদের জন্য বিরাট স্বাধীনতা দিয়েছে। বনিবনা না হোক, তবুও ওদের সারাজীবন একসঙ্গে থাকতে হবে, এমন নির্দেশ ইসলাম দেয় না। ইসলাম শান্তির ধর্ম। ইসলাম মানুষকে দুনিয়া ও আখিরাতে শান্তি দিতে চায়। এক বছর একত্রে থাকার পরও যদি পরস্পরের দোষগুলোই শুধু ফুটে ওঠে, গুণ মোটেও ধরা না পড়ে, তাহলে একত্রে থাকা উচিত নয়।

মেয়েদের পছন্দের মূল্য

রাসূল ﷺ-এর জামানায় বিয়ের পরদিনই জামিলা নামের এক সুন্দরী মহিলা সাহাবি রাসূল ﷺ-এর নিকট হাজির হলেন। তাঁর স্বামী (সাবিত)-কে তালাক দেওয়ার ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য রাসূলের নিকট আবেদন করলেন।

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার নামক গ্রন্থ থেকে আমি বিষয়টি তুলে ধরছি।

তাঁর ঘটনা এই যে, সাবিতের চেহারা তাঁর পছন্দনীয় ছিল না। তিনি খোলা তালাকের জন্য নবি ﷺ-এর কাছে বিচার প্রার্থনা করলেন। আর নিম্নোক্ত ভাষায় অভিযোগ পেশ করলেন—

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমার মাথা ও তাঁর মাথাকে কোনো বস্তু কখনও একত্র করতে পারবে না। আমি ঘোমটা তুলে তাকাতেই দেখলাম, সে কতগুলো লোকের সঙ্গে সামনের দিক থেকে আসছে। কিন্তু আমি তাকে ওদের সবার চেয়ে বেশি কালো, সবচেয়ে বেঁটে এবং সবচেয়ে কুৎসিত চেহারার দেখতে পেলাম।’ ইবনে জারির

‘আল্লাহর কসম! আমি তাঁর দীনদারি ও নৈতিকতার কোনো কারণে তাকে অপছন্দ করছি না; বরং তাঁর কুৎসিত চেহারা আমার কাছে অপছন্দনীয়।’ ইবনে জারির

‘আল্লাহর শপথ! যদি আল্লাহর ভয় না থাকত, তাহলে যখন সে আমার কাছে আসে, আমি তাঁর মুখে থুথু নিক্ষেপ করতাম।’ ইবনে জারির

‘হে আল্লাহর রাসূল! আমি সুন্দরী ও সুশ্রী আর সাবিত হচ্ছে এক কুৎসিত ব্যক্তি।’ ফাতহুল বারির হাওয়ালায় আবদুর রাজ্জাক

‘আমি তাঁর দীনদারি ও নৈতিকতার ব্যাপারে কোনো অভিযোগ করছি না। কিন্তু ইসলামে আমার কুফরের ভয় হচ্ছে।’ সহিহ বুখারি : ৪৮৮৮

‘ইসলামে কুফরের ভয়’ কথাটির অর্থ হচ্ছে, ঘৃণা ও অপছন্দ হওয়া সত্ত্বেও যদি আমি তাঁর সঙ্গে বসবাস করি, তাহলে আমার আশঙ্কা হচ্ছে স্বামীর আনুগত্য, বিশ্বস্ততা ও সতীত্বের হিফাজতের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যেসব নির্দেশ দিয়েছেন, আমি তা পালন করতে পারব না। এ হচ্ছে একজন ঈমানদার নারীর দৃষ্টিভঙ্গি। যিনি আল্লাহর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করাকে কুফরি মনে করেন।

নবি ﷺ তাঁর অভিযোগ শুনলেন, অতঃপর বললেন, ‘সে তোমাকে যে বাগানটি দিয়েছিল, তুমি কি তা ফেরত দেবে?’

সে বলল, ‘হ্যাঁ।’

সে তাঁর বাগান সাবিতের কাছে হস্তান্তর করল। তিনি সাবিতকে নির্দেশ দিলেন, তাঁর স্ত্রীকে পৃথক করে দেওয়ার জন্য। ফলে তিনি তাকে পৃথক (তালাক) করে দিলো। সহিহ বুখারি : ৪৮৮৮

স্ত্রীর পছন্দ না হওয়ার কারণেই বিখ্যাত সাহাবি য়ায়েদ বিন হারেসার সঙ্গে জয়নাব বিনতে জাহাশের বিবাহ বন্ধনও টিকেনি, অথচ বিয়েটা দিয়েছিলেন রাসূল ﷺ নিজে পছন্দ করে।

হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা.)-এর আজাদকৃত দাসী বারিরার ঘটনাও ছিল এমন। আজাদ হওয়ার পর বারিরা তাঁর ক্রীতদাস স্বামীকে তালাক দেওয়ার জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে মিনতি জানায়।

ইবনে আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত,

‘বারিরা’র স্বামী মুগিস ছিল একজন ক্রীতদাস। এখনো আমার চোখের সামনে সে দৃশ্য ভাসছে। মুগিস কাঁদতে কাঁদতে তাঁর পিছে পিছে ছুটছে আর তার চোখের পানি দাড়ি বেয়ে পড়ছে। (এ দৃশ্য দেখে) নবি ﷺ আব্বাস (রা.)-কে বললেন, “হে আব্বাস! বারিরার প্রতি মুগিসের ভালোবাসা আর মুগিসের প্রতি বারিরার উপেক্ষা কতই না আশ্চর্যজনক!” নবি ﷺ সেই মেয়েকে বললেন, “তুমি যদি মুগিসের নিকট পুনরায় ফিরে যেতে!” সে বলল, “ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ?” তিনি বলেন, “আমি অনুরোধ করছি।” বারিরা বলল, “তাকে আমার প্রয়োজন নেই।” সহিহ বুখারি : ৪৮৯৫

অতএব, পছন্দ না হলে, খাপ খাওয়াতে না পারলে, রুচিতে না মিললে, বনিবনা না হলে, পরস্পরকে ভালোবাসতে না পারলে, বিয়ে হয়েছে বলেই যে একসঙ্গে থাকতে হবে, জীবন বিষিয়ে তুলতে হবে, যন্ত্রণায় জর্জরিত হতে হবে এবং এই যন্ত্রণা থেকে মুক্তির পথ নেই, এমন কথা ইসলাম বলে না; বরং ইসলাম সব জায়গায় শান্তি স্থাপন করতে চায়।

অথচ আমাদের সমাজে মেয়েদের পছন্দ-অপছন্দের মূল্য খুব কমই দেখা হয়। অনেক ক্ষেত্রে ছেলেদের পছন্দের মূল্যও দেওয়া হয় না। আত্মীয়স্বজনের পছন্দের মূল্য দিতে গিয়ে সংসারটাকে স্থায়ী জাহান্নামে পরিণত করা হয়। আর পরবর্তীকালে এর মাসুল হিসেবে কঠিন কষ্টে নিষ্কিন্তু হয় কয়েকটি নির্দোষ, নিষ্পাপ শিশু।

এই দেশের এক জামিলা

বাংলাদেশের একজন জামিলার কথা বলি। বিয়ের পর থেকেই স্বামীর সঙ্গে তাঁর বনিবনা হচ্ছিল না। চোন্দো বছরের জামিলার পুকুর পাড়ে বসে কচুরির ফুল দেখতে ভালো লাগত। রাজহাঁসের সঙ্গে সাঁতার কাটতে ইচ্ছে হতো। জোছনার আলোয় রাতের তারা দেখতে ভালো লাগত। ভালো লাগত ধানের খেতে দোল খাওয়া বাতাসের ঢেউ দেখতে। ভালো লাগত নদীতে ডুব দিয়ে শালুক তুলে আনতে। ভালো লাগত গল্প-উপন্যাস-কবিতা পড়তে। মাঝে মাঝে লুকিয়ে কবিতাও লিখত জামিলা। বিকেল বেলা বাড়ির পাশের ফুলের বাগানে বসে আনমনে সেই কবিতা পড়ত।

আর এসব অনাসৃষ্টি কাজ-কারবার জামিলার স্বামী, শাশুড়ি একদম পছন্দ করত না। এজন্য জামিলাকে শাশুড়ির কাছে প্রচুর বকাঝকা শুনতে হতো, স্বামীর কাছে মারও খেতে হতো। জামিলা কিছুতেই মন বসাতে পারেনি এই সংসারে। মা-বাবার কাছে তাঁর সমস্যার কথা বলেছিল। কিন্তু তাঁর সমস্যাকে কেউ সমস্যাই মনে করেনি। জামিলার মামি, চাচি, ভাবিরা সংসার করার অযোগ্য বলে জামিলারই দোষ দিয়েছে।

এভাবেই কেটে গেছে তার জীবনের নির্জীব দিনগুলো। এখন জামিলা বেগমের বয়স অনেক। তাঁর কবিতারা এখনো মরে যায়নি, মাঝে মাঝে এখনো কবিতারা এসে ভিড় করে কলমের কালিতে। তাই সে লিখে যায় অবিরত। এসব তাঁর স্বামী দেখলেই বলে, এই বয়সেও তোমার ঢং গেল না!

কথা প্রসঙ্গে জামিলাকে বলেছিলাম, রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘ওই পুরুষ ব্যক্তিটি উত্তম, যে তাঁর স্ত্রীর বিবেচনায় উত্তম।’ জামে তিরমিজি : ৩৮৯৫

মানে স্ত্রী যদি সাক্ষ্য দেয়, তাঁর স্বামী ভালো মানুষ, তাহলেই সেই পুরুষ সমাজে ও আল্লাহর কাছে ভালো বলে গৃহীত হবে। জামিলা বললেন, ‘আমাকে যদি মহান আল্লাহ মৃত্যুর পরে জিজ্ঞেস করেন, “তোমার স্বামী কেমন লোক ছিল?” আমি বলব, “মাবুদ গো! আমি তাকে কোনোদিন নামাজ কাজা করতে দেখিনি, রোজা ভাঙতে দেখিনি, তাই তোমার জান্নাতের সর্বোচ্চ দরজাটা তাকে দিও। তবে হে আমার মাবুদ মাওলা! পরকালে শুধু আমাকে ওর সঙ্গে জুড়ে দিও না। দুনিয়াতে আমাকে ওর সঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলে। আমি সারা জীবন ছটফট করেছি। সবকিছু নীরবে সহ্য করেছি, আখিরাতে তুমি ওর সঙ্গে আমাকে দিও না আল্লাহ। আমাকে শুধু জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়ে জান্নাতের একপাশে একটু জায়গা দিও। আমি বড়ো কোনো বালাখানা চাই না আল্লাহ! শুধু ওর হাত থেকে মুক্তি চাই।”’

জামিলা বেগমের অশ্রুসজল মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। এই মনোকষ্ট নিয়ে আমাদের দেশের অনেক জামিলা সংসার করছে বা করতে বাধ্য হচ্ছে। কোনো নারীকে ইসলামে এভাবে সংসার করতে নির্দেশ দেয়নি। তবে একদল আছেন, যারা এজন্য সব দোষটুকুই চাপাতে চায় ইসলামের ওপর। এ মনোভাব কেবল অজ্ঞতা ও বিদ্বেষপ্রসূত। ইসলাম কখনও কারও ওপর জুলুম করে না। নারীর ওপর তো নয়ই; পুরুষের ওপরও নয়। ইসলাম উভয়কে শিক্ষা দেয় ত্যাগ ও আপস করে চলার জন্য। ইসলামের পরিভাষায় তার নাম ‘ইহসান।’ স্ত্রীর কোনো একটা ত্রুটি খারাপ লাগলে তাঁর একটি গুণের দিকে তাকিয়ে ভালো থাকা যায়।

শুধু দাম্পত্য জীবনেই নয়, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে যদি আমরা এই মনোভাব পোষণ করতে পারি, তাহলেই শান্তি, তাহলেই মুক্তি। ‘ইহসান’ ছাড়া রাষ্ট্র, সমাজ, পরিবার কোথাও শান্তি স্থাপন সম্ভব নয়।

আজকের প্রয়োজন, আগামীকালের অপ্রয়োজন

আমরা কতদিন বাঁচব? আজ যে জিনিসটা খুবই প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়; ছয় মাস পরে পৃথিবীতে থাকতেই সেই জিনিস আর তেমন প্রয়োজনীয় বলে মনে হয় না। মরে গেলে তো কথাই নেই।

একবার পছন্দ করে বাঁশের তৈরি খুব সুন্দর একটা শো-পিস কিনেছিলাম। সেটাকে যত্ন করে টেবিলের ওপর সাজিয়ে রাখলাম। সবাই শো-পিসটার সৌন্দর্যের প্রশংসা করতে লাগল। আমার ছোটো ননদের মেয়ে নুরজাহান এসে শো-পিসটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখতে লাগল। ওর দৃষ্টি জুড়ে একটি মুগ্ধতা আমি লক্ষ করলাম। এক দৃষ্টিতে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে সে। ওর দেখার ধরন দেখে

আমার আশঙ্কা হলো শো-পিসটা ও চেয়ে বসতে পারে। আর একবার ওর মায়ের সামনে যদি নিতে চায়, তখন আমার তো আর না দিয়ে উপায় থাকবে না। নুরজাহান একটু সরে যেতেই আমি শো-পিসটা লুকিয়ে রাখলাম। কিছুক্ষণ পরে নুরজাহান তার মাকে বলতে লাগল, ‘মা, আমি সেই জিনিসটা নেব।’

ওর মা বুঝতে না পেরে বলল, ‘কোন জিনিস?’

ছোটো মানুষ বলে সে মাকে কথাটা বুঝিয়ে বলতে পারল না। আর আমি সব বুঝে শুনেও চুপ করে থাকলাম। দুদিন পর নুরজাহানরা চলে গেল। যাওয়ার সময়ও নুরজাহান বলল, ‘মা, সেই জিনিসটা নেব।’ ওর মা আবার বলল, ‘কোন জিনিস?’ এবারও নুরজাহান ঠিকমতো বলতে পারল না। ওর মা ধমক দিয়ে বলল, ‘কোন জিনিস ঠিকমতো বলতে পারিস না, তাহলে শুধু প্যা প্যা করিস ক্যান?’

খারাপ মন নিয়ে চুপ করে থাকল নুরজাহান। ওরা চলে যাওয়ার পর আমিও শো-পিসটার কথা একদম ভুলে গেলাম। প্রায় তিন মাস পর মনে হলো। আমি তাড়াতাড়ি শো-পিসটা বের করতে গেলাম। ধরতেই বুরবুর করে ভেঙে পড়ল কাঁচা বাঁশের তৈরি সুন্দর সেই শো-পিসটা। আমার ছোটো মনের শাস্তি এভাবেই পেলাম। লজ্জায় আর অনুতাপে মনটা ভেঙে গেল। বারবার মনে হতে লাগল, ‘ছি! কী ছোটো মন আমার! কেন জিনিসটা আমি নুরজাহানকে দিলাম না? কত টাকারই-বা জিনিস ছিল ওটা?’ নিজেকে বারবার ধিক্কার দিচ্ছিলাম।

ছোটো নুরজাহান এখন বড়ো হয়েছে। ওর মামির ছোটোলোকির কথা নিশ্চয়ই ওর মনে নেই। কিন্তু আমি ভুলতে পারিনি। সেই দিন থেকে আমার প্রয়োজনীয় কিংবা অতি পছন্দের কোনো জিনিসও যদি কেউ চায়, আমার তখন সেই ছোট নুরজাহানের কথা মনে পড়ে। আমি আর না বলতে পারি না।

আসলে পছন্দ, প্রয়োজন যা-ই বলি না কেন, এগুলো সবই আপেক্ষিক। আর পৃথিবীতে একান্তই নিজের বলে কোনো জিনিস নেই। আজ যা আমার, সেটা মৃত্যুর পরে অন্যের হয়ে যায়। এই ক্ষণিকের দুনিয়ায় নিজের অর্জিত আমল ছাড়া আমার বলতে কিছুই নির্দিষ্ট নেই।

আমার জীবনেরই আরেকটি ঘটনা।

যশোর শহরে আমি একটা বাড়ি কিনেছিলাম, যা এক ব্যক্তি ‘হাউস বিল্ডিং করপোরেশন’ থেকে লোন নিয়ে তৈরি করেছিল। আমি তার কাছ থেকে ধীরে ধীরে লোন পরিশোধ করার শর্তে স্বল্পমূল্যে সেটা কিনেছিলাম।

ওই বাড়ির পাশেই আমার ছোটো খালার তিন শতক জমি ছিল। জমিটা এমনিতেই পড়ে ছিল। কোনো গাছ-পালাও লাগানো ছিল না। অন্যদিকে বর্ষাকালে একটু বৃষ্টি হলেই আমার উঠোনে পানি জমে যেত। তাই একদিন ছোটো খালার জমি থেকে কিছু মাটি কেটে এনে আমাদের উঠোনে দিলাম।

ভাবলাম বর্ষা পার হলে পুকুর থেকে মাটি এনে ছোটো খালার জমিটা ভরে দেবো। কিন্তু ছোটো খালা দেখে খুবই রাগারাগি করতে লাগল। আমার মায়ের কাছে নালিশ দিলো। আমি তাড়াতাড়ি ছোটো খালার হাত চেপে ধরে বললাম, ‘খালা, রাগ করিস না। এই বর্ষাটা পার হলেই তোর জমি ভরাট করে দেবো।’

ছোটো খালা বয়সে আমার ছোটো। তাই সে আমাকে খালা বলে ডাকে। বলল, ‘না খালা, কাজটা তুমি ভালো করোনি।’

আমি বললাম, ‘খালা, ঠেকায় পড়ে করেছি। তুই কিছু ভাবিস না, তোর জমি আমি ঠিকই ভরে দেবো।’

কী আর করার? অসন্তুষ্ট মন নিয়েই খালা চুপ করে গেল। হয়তো মনে মনে অনেক গালাগালও করেছিল আমাকে।

এদিকে এই ঘটনার কিছুদিন পরে আমার স্বামী বারবার বলতে লাগল, ‘এই লোন পরিশোধ করার সামর্থ্য আমার নেই। এর চেয়ে দুকাঠা জমি কিনতে পারলেও ভালো হতো। যেদিন পারতাম সেদিন বাড়ি করতাম। পছন্দমতো বাড়ি করতাম।’ অগত্যা বাড়ি বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিলাম। সেই ছোটো খালা জানতে পেরে বলল, ‘তাহলে বাড়িটা তুমি আমাকেই দাও, আমি লোন পরিশোধ করি। আর তুমি আমার জমিটা নাও।’ প্রস্তাবটা আমাদের কাছে ভালোই ঠেকল। ফলে তাই করলাম।

এখন মজার ব্যাপার হলো, যে বাড়ির উঠোন উঁচু করার জন্য ছোটো খালার কাছে গালমন্দ শুনেছি, সেই বাড়িটা এখন তার। আর ছোটো খালার যে জমি আমি গর্ত করেছিলাম, সেই জমিটা এখন আমার। দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চ খুবই বিচিত্র!

দুনিয়াতেই যখন এভাবে মালিকানার পরিবর্তন হয়, তখন সেই সম্পদ নিয়ে মানুষের সঙ্গে ঝামেলা করা, ঝগড়া-ঝাটি করার কোনো মানে আছে? আর বিশ বছর পরে আমার এই বাড়িতে, এই ঘরে যারা বাস করবে, তাদের আমি চিনি না। বিশ বছর তো অনেক দূরের কথা বললাম। আমার মৃত্যুর কোনো দিন-তারিখ তো আমার জানা নেই। কোনো স্ত্রী মারা গেলে তার স্বামীর আরেকটা বিয়ে করার সম্ভাবনা আছে। তখন স্ত্রীর বাড়ি-ঘর, পোশাক, গহনা, তৈজসপত্র, সবকিছুর মালিক হবে সতিন; যে বাঙালি নারীর সবচেয়ে বড়ো দুশমন। তাহলে আমরা কেন হক, হালাল-হারামের কথা না ভেবে সম্পদের পাহাড় গড়ব? কেন এসব নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কিংবা অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে অযথা মনোমালিন্য কিংবা ঝগড়া-ঝাটি করব?

সম্পদের জন্য চরম অন্যায় করা

সম্পদের জন্য একটা চরম অন্যায় ও কঠিন কাজ আমাদের দেশের ৯০% লোকেই করে থাকে বলে আমার ধারণা। তা হলো, বোন কিংবা কন্যা সন্তানকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করা। এসব ক্ষেত্রে সবটুকু ত্যাগ করতে হয় বেচারি বোন কিংবা হতভাগী মেয়েটিকে। সম্পত্তির দাবি ছেড়ে দিয়ে তাকে আপসে আসতে হয়। এটা মেয়ের প্রতি জুলুম, চরম জুলুম! আল্লাহর নির্দেশনার সরাসরি বরখেলাপ।

অধিকাংশ বাপ-ভাইয়েরাই তাদের কন্যা ও বোনদের সঙ্গে এই জুলুম করে থাকেন। অনেক সময় মায়েরাও এই জুলুমে অংশ নেন। মা মেয়েকে আদর করে বলে, ‘তোমাকে তো ভালো জায়গায় বিয়ে দিয়েছি, তোমার তো কোনো কিছুর অভাব নেই! আমরা আর কয়দিন আছি? আমরা মরে যাওয়ার পর এই ভাইয়ের বাড়িতেই তোমাকে আসতে হবে। তুমি বরং এই সম্পত্তি তোমার ভাইকে লিখে দাও।’ মায়ের এ কথা শোনার পর মেয়ের আর কিছু বলার থাকে না। সে চুপ করে থাকতে বাধ্য হয়। হৃদয়ে রক্তক্ষরণ নিয়ে সব দাবি ছেড়ে দেয়।

মেয়ের বেলায় এত আবেগী কথা; তো ছেলেকে একবার বলুক তো দেখি, ‘তোমার বোনের আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ। তোমার তো অভাব নেই। তোমার অংশটা বোনকে দিয়ে দাও কিংবা কিছুটা বেশি দিয়ে দাও।’ দেখুক তো তার আদরের দুলাল কথাটা রাখে কি না? এতটুকু ত্যাগ করে কি না? কিন্তু এই ত্যাগ মেয়েরা করে আসছে যুগ যুগ ধরে। অবশ্য একে ত্যাগ (Sacrifice) বললে ভুল হবে। বলতে হবে মেয়েরা মুখ বন্ধ করে এই জুলুম যুগ যুগ ধরে সহ্য করে আসছে।

আবার অনেক ক্ষেত্রে বাবারা জীবদ্দশাতেই তাদের ছেলেদের নামে জমিজমা লিখে দেয়; যাতে পরবর্তীকালে মেয়েরা ভাগ নিতে না পারে। আমার পরিচিত এক ভদ্রলোক তার ছেলেদের একদিন বলল, ‘আমি গতকাল রেজিস্ট্রি অফিসে গিয়ে তোমাদের তিন ভাইকে দশ বিঘা করে মোট ত্রিশ বিঘা জমি দলিল করে দিয়েছি।’

বড়ো ছেলে বলল, ‘কেন বাবা?’

বাবা হাসি মুখে বলল, ‘আগেই দশ বিঘা আলাদা করে দিলাম।’

ছেলে আবার বলল, ‘তোমার চার মেয়েকে কী দিলে?’

‘আমার তো আরও জমি আছে, সেখান থেকে তারা নেবে।’

ছেলে বলল, ‘বাবা, তুমি গত বছর হজ করে এসেছ। পেছনের গুনাহ হয়তো মহান আল্লাহ সব মাফ করে দিয়েছেন। সেই নিষ্পাপ আমলনামা ওয়ারিশ ঠকানো পাপে কেন আবার পূর্ণ করছ? হয় তুমি এই জমি ফেরত নাও, নয়তো তোমার চার মেয়েকে পাঁচ বিঘা করে বিশ বিঘা লিখে দাও। তা নাহলে আখিরাতে তুমি মহা বিপদে পড়ে যাবে বাবা।’

বাবা আর কী করবেন? চার মেয়েকে পাঁচ বিঘা করে জমি লিখে দিলেন। এই ভদ্রলোকের ছেলের মতো আমাদের সমাজে কয়জনের ছেলে আছে?

বরং ছেলেরাই চাপ সৃষ্টি করে বোনদের ঠকিয়ে মা-বাবার কাছ থেকে জমি লিখে নেয়। আর যে বাবারা কাউকে লিখে না দিয়ে মারা যান, সে সম্পদও ভাইয়েরা বোনদের দেয় না বা দিতেও চায় না। বোনেরা নিতে চাইলে বোনদের সঙ্গে সম্পর্কই নষ্ট করে ফেলে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাবা-মায়ের সম্পদ থেকে বোনেরা বঞ্চিত হয়।

ব্যতিক্রমও আছে

সবাই কি এরকম? না, ব্যতিক্রমও আছে। একদিন আব্বা আমাকে বললেন, ‘ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে তুমি নাকি বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দাও। তো আমার একটা সমস্যার সমাধান দাও তো।’

হাসিমুখে বললাম, ‘কী এমন সমস্যা আপনার, বলুন?’

আব্বা বললেন, ‘আমার বোনের বিয়ের সময় বাবা এক বিঘা জমি বিক্রি করেন। তবে একটা মৌখিক শর্ত দিয়েছিলেন যে, কোনোদিন যদি ওই ব্যক্তি এ জমি বিক্রি করে, তাহলে যেন আগে আমাদের জানায়। তেরো বছর পর ওই ব্যক্তি সেই জমি বিক্রি করবে বলে আমাকে জানায়। তখন আমি প্রায় তিনগুণ মূল্যে ওই জমিটা খরিদ করে নিই। যেহেতু বাবা তখন জীবিত ছিলেন, তাই জমিটা আমার নামে দলিল না করে বাবার নামেই দলিল করি। বাবা অবশ্য বলেছিলেন, ‘তোমার নামেই দলিল করো।’ কিন্তু আমার বিবেক সায় দেয়নি। নিজের নামে দলিল লেখার কথা শুনে লজ্জাও লেগেছিল। যদিও আমার রোজগারের টাকা দিয়েই জমিটা কিনেছিলাম

এমনকী ওইসময় টাকা কিছু কম হওয়াতে তোমার মায়ের গহনা বিক্রি করে টাকা জোগাড় করেছিলাম। এখন তো বাবা নেই, মাও নেই। আমরা দুই ভাই-বোন। সব সম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তোমার ফুপু আশ্মা পাবে। তা আমার ওই জমির অংশ কি তোমার ফুপুকে দিতে হবে?’

বললাম, ‘বাহ্যিক আইনে তো দিতেই হবে; যেহেতু তার বাবার নামে জমি। তা সে যেই খরিদ করুক না কেন।’

আব্বা হাসিমুখে বললেন, ‘আর অন্য দৃষ্টিতে?’

আমি বললাম, ‘আপনি ওই হাদিসটা জানেন না, ‘তুমি আর তোমার সম্পত্তি তোমার বাবার।’ (মুত্তাফাকুন আলাইহি)

আব্বা হেসে বললেন, ‘রায়টা ফুপুর পক্ষেই দিলে।’

বললাম, ‘না, আপনার পক্ষে দিয়েছি। হাদিসটা তো ঠিক, তাই না? আপনার মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি আপনার বোনের ছেলেমেয়েরা ভোগ করল, না সবটাই আপনার সন্তানেরা ভোগ করল, তাতে আপনার কী এসে যায়। আমি চাই আখিরাতে কোনো প্রকার সমস্যায় যেন আপনি না পড়েন।’

আমার কথায় আব্বা যে কী খুশি হলেন! আমার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করে দিয়ে বললেন, ‘মা আমার’!

আমার আব্বা তাঁর সমুদয় পিতৃসম্পত্তির তিন ভাগের এক ভাগ তাঁর বোনকে বুঝিয়ে দেন। আমার ফুপুআশ্মা নিতে চাননি। বলেছেন, ‘ভাই, তুমি কেন এভাবে জোর করে দিচ্ছ? আমি কি তোমার কাছে চেয়েছি? মানুষে শুনলে কী বলবে?’

আব্বা বলতেন, ‘চাওয়ার কী আছে? আর মানুষেরই বা বলার কী আছে? তোমার সম্পত্তি তুমি নিবে, ব্যাস।’

আমর ফুপুআম্মার সঙ্গে কথা বলতে গেলে, দেখা করতে গেলে, তার ভাইয়ের প্রশংসা ছাড়া কথা শেষ হয় না। বলেন, ‘আমার ভাইয়ের মতো এমন ভাই আর কি কোথাও আছে? আগে তো আমি ভাই সোহাগী ছিলাম আর এখন হয়েছি ভাইয়ের শোকে পাগল।’ এভাবে বলতে বলতে একসময় কান্না শুরু করে দেন। মাঝে মাঝে বিভ্রান্তিতে পড়ে যাই, আমার বাবাকে আমি বেশি ভালোবাসি, নাকি আমার ফুপুআম্মা বেশি ভালোবাসেন?

ভাইয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই ফুপুআম্মা কাঁদতে শুরু করেন।

আহা! এমন ভাই যদি ঘরে ঘরে জন্ম নিত।

বোনদের সব সম্পত্তি এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া

অনেক জায়গায় এমনটি হয়ে থাকে। পিতার মৃত্যুর পরে বোনদের সব সম্পত্তি, এমনকী মায়ের সম্পত্তিও আলাদা করে এক ভাইকে দিয়ে দেওয়া হয়, আর বোনদের দায়দায়িত্ব তখন সেই ভাই-ই পালন করেন। বিবাহিত বোনরাও ওই ভাইয়ের বাড়িতেই বেড়াতে আসে, অন্য ভাইয়েরা তখন প্রায় পর হয়ে যায়। কী আজব কথা! আপন ভাইয়ের বাড়ি বেড়াতে আসতে হলে নিজের সম্পত্তি জমা রেখে তবেই আসতে হবে কেন? এভাবেই রক্তের সম্পর্ক ঠিক রাখতে হবে? অথচ ভাই যখন বোনের বাড়িতে যায়, বোন তখন জান-প্রাণ দিয়ে ভাইয়ের আদর-যত্ন করার চেষ্টা করে। কেন? বোনের বাড়িতে ভাই কি কোনো সম্পদ জমা রেখে এসেছে?

না, কোনো অজুহাতেই বোনের কিংবা মেয়ের সম্পত্তি আটকে রাখা যাবে না। তা বোন ধনী হোক, গরিব হোক। তার নির্দিষ্ট পাওনা তাকে বুঝিয়ে দিতেই হবে। যারা আল্লাহ রচিত মিরাসের আইন পরিবর্তন করে, তাদের জন্য আল্লাহ তায়ালা চিরন্তন শাস্তির কথা বলেছেন। তিনি বলেন—

‘আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানি করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমারেখা অতিক্রম করে যাবে, তাকে আল্লাহ আগুনে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে থাকবে চিরকাল। আর তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণা ও অপমানজনক শাস্তি।’ সূরা নিসা : ১৪

উপরোক্ত আয়াতটি সম্পত্তি বণ্টনসংক্রান্ত আল্লাহর বিধান যারা লঙ্ঘন করবে, তাদের সম্পর্কে নাজিল হয়েছে। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘কেউ যদি কোনোভাবে ওয়ারিশকে ঠকায়, সে জান্নাতের গন্ধও পাবে না। যদিও জান্নাতের গন্ধ পাওয়া যাবে পাঁচশো বছরের দূরত্বের রাস্তা থেকে।’ সহিহ বুখারি

অত্যন্ত আশ্চর্য আর পরিতাপের বিষয় এমন মারাত্মক অপরাধের কথা জেনেও মুসলমানরা মিরাস বা উত্তরাধিকারী আইনের ব্যাপারে নাফরমানি করছে। অথচ তারা নামাজ, রোজা, হজ, জাকাতে নিয়মিত পাবন্দ হয়। এটা আল্লাহর আইনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের শামিল। দু-একটি ব্যতিক্রম ঘটনা ছাড়া প্রায় সর্বত্রই এই নাফরমানি চলছে। ধনী-গরিব নির্বিশেষে সবাই এই কঠিন গুনাহে নিমজ্জিত। তারা কুরআন-হাদিস জানে না। অনেকে তো মনে করে, মেয়েদের বাপের সম্পত্তি নেওয়া মানেই মস্ত বড়ো একটা অপরাধের কাজ। আর যারা কুরআন-হাদিস জানে তারাও যেন এই একটি ব্যাপারে চরমভাবে অবুঝ!

বাবা-ভাইদের এই নির্যাতন থেকে কবে মুক্তি পাবে নারীসমাজ? কবে ইসলামের অনুসারী হবে এই পুরুষরা? নিজের আপন আদরের বোনকে ঠকিয়ে কেমনে শান্তি পায় এই পুরুষরা? তাহলে কবরে ‘মান রব্বুকা-মান দ্বীনুকা’র কী জবাব দেবে তারা?

এই বাবাদের মন-মানসিকতা আমি বুঝতে পারি না। পুত্রটি তার সন্তান, আর মেয়েটি কি তার সন্তান নয়? অথচ রাসূল ﷺ এই কন্যাকে নিয়ে কত দিক-নির্দেশনাই না দিয়েছেন।

এই বাবা আর ভাইদের অন্তরে কি আল্লাহ ভালোবাসা নামক অনুভূতিটি দেননি? এই চরম স্বার্থপর মানুষগুলোর অন্তর থেকে ভালোবাসার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর ভয়ও উঠে গেছে। অনেক সময় এদেরকে বলতে শোনা যায়, ‘আমার স্ত্রী কিংবা পুত্রবধূ বাপের বাড়ির সম্পত্তি আনতে পারেনি, তাহলে আমি আমার বোন কিংবা মেয়েকে সম্পত্তির ভাগ দেবো কেন?’ কথাটা কী হলো? এমন হলো কি না যে, ‘আমার স্ত্রীর কিংবা পুত্রবধূর বাবা-ভাই যদি জাহান্নামের আগুনে জ্বলে তো আমি জ্বলব না কেন?’

জালিমকে সহযোগিতা করা

আল্লাহর আইন অমান্য করার ক্ষেত্রে ভাইদের সহযোগিতা করে স্বেচ্ছায় মুখ বুজে সম্পত্তি ছেড়ে দেওয়া বোনদের কোনো অবস্থাতেই উচিত নয়। ‘রাসূল ﷺ বলেছেন, ‘মজলুমকে সাহায্য করো, জালেমকেও সাহায্য করো।’ সাহাবি (রা.) বললেন, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! মজলুমকে তো সাহায্য করব বুঝলাম, কিন্তু জালেমকে কীভাবে সাহায্য করব?’ রাসূল ﷺ বললেন—

‘জালিমকে জুলুম করা থেকে বিরত রাখবে। এটাই তাকে সাহায্য করা।’ সহিহ বুখারি : ৬৯৫২

অতএব, বোনদের উচিত ভাইদের অন্যায় আচরণ মুখ বুজে সহ্য না করে প্রতিবাদ করা। অনেক বোন আবার উপায় না দেখে বলে, ‘আমি যদি স্বেচ্ছায় আমার ভাইকে আমার সম্পত্তি দিয়ে দিই, তাহলে দোষের কী আছে?’

না, স্বেচ্ছায় সব সম্পত্তি ভাইকে দেওয়ার অধিকার কোনো বোনের নেই। তাহলে সে নিজেই ওয়ারিশ ঠকানো পাপে পাপী হবে। কারণ, মেয়ের ওয়ারিশ তার স্বামী ও সন্তানেরা। ওই সমস্ত পিতা ও ভাইয়েরা যে সামান্য দুনিয়াবি স্বার্থে আল্লাহর আইন অমান্য করছে, মহান রবের বিধানের অবমাননা করছে, তা তাদের বোঝানো উচিত।

বুঝলে ভালো, না বুঝলে করার কিছু নেই। তবে বোনের পাওনা আদায় করে নেওয়া উচিত। আল্লাহর বিধান মানার ব্যাপারে কোনো আপস করা যাবে না। অন্যায়ের সঙ্গে কোনো সমঝোতা নেই।

আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে অনড় থাকা

আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী, ভাই-বোন সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও হৃদয়তা টিকিয়ে রাখার জন্য ভালোবাসার কথা বলছি। বলছি ভালোবাসা বৃদ্ধি করার জন্য ত্যাগ ও আপস করে চলতে। ইসলামও আমাদের সেই শিক্ষা দেয়। তাই তো দেখি যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও পিপাসার পানিটুকু নিজে পান না করে অপর ভাইয়ের দিকে ঠেলে দিতে। দেখি নিজে না খেয়ে মেহমানকে খাওয়াতে। নিজের চেয়ে অপর ভাইকে অগ্রাধিকার দিতে। তবে আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে কোনো আপস চলবে না। আল্লাহকে অসম্মুখ করে কোনো বান্দার সম্মুখির প্রয়োজন নেই। মক্কার কাফির সর্দাররা যখন প্রস্তাব দিলো, ‘মুহাম্মদ, এসো তুমি কিছুদিন আমাদের দেবতাদের উপাসনা করো, আমরাও কিছুদিন তোমার রবের উপাসনা করি।’ অর্থাৎ তুমি কিছু ছাড় দাও, আমরাও কিছু ছাড় দিই। তারা একটা সমঝোতায় আসতে চেয়েছিল। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বললেন—

‘হে মুহাম্মদ! বলুন, হে কাফেররা, আমি যার ইবাদাত করি, তোমরা তাঁর ইবাদাত করো না। তোমরা যাদের ইবাদাত করো, আমি তাদের ইবাদাত করি না... তোমাদের কাছে তোমার দীন, আমার কাছে আমার দীন।’ সূরা কাফিরুন : ১-৪

অর্থাৎ দীনের ব্যাপারে কোনো ছাড় দেওয়া বা আপস করার সুযোগ নেই। সাহাবির তর ব্যস্তব প্রমাণ দেখিয়েছেন। যেমন : হজরত আনাস (রা.) -এর মা উম্মে সুলাইমের বেদীন স্বামী তাকে বললেন, ‘তুমি যদি এই নতুন দীন না ছাড়ো, আমি তোমার সঙ্গে থাকব না। চলে যাব দূরের কোনো দেশে।’

উম্মে সুলাইম অনেক চেষ্টা করলেন স্বামীকে বোঝাতে, কিন্তু হতভাগ্য স্বামী কিছুতেই হেদায়েতের বুঝ বুঝল না। উম্মে সুলাইমও তাঁর সিদ্ধান্তে অটল রইলেন। আল্লাহর বিধান পালনের ক্ষেত্রে তিনি কোনোভাবেই ত্যাগ করলেন না।

এই জামানার উম্মে সুলাইম

এমনই একটি বাস্তব প্রমাণ পেশ করল এই জামানার উম্মে সুলাইম। নাম তাঁর অধ্যাপিকা লাবণ্য। লাবণ্যকে খুব মনে পড়ে, ভুলতে পারি না। লাবণ্যের সঙ্গে প্রথম পরিচয় আমার অসুস্থতার সময়ে। আমাকে দেখতে এসেছিল আমার বান্ধবী মোতাহারুন্নেসার সঙ্গে। প্রথম দেখাতেই মেয়েটিকে অসম্ভব ভালো লাগল আমার। ওর দিকে তাকিয়ে মনে হলো, ওর লাবণ্য নামটা যথোপযুক্ত হয়েছে, সার্থক হয়েছে। যেন একটা পবিত্রতা সর্বক্ষণ ঘিরে আছে ওকে। সবসময় চোখে-মুখে হাসি খেলা করে। মানুষকে আপন করে নেওয়ার একটি দুর্লভ যোগ্যতা আছে ওর। লাবণ্য কলেজের প্রভাষক। এরপর মাঝেমধ্যেই সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসত। কখনও মোতাহারুন্নেসার সঙ্গে, কখনও একা। ওর কলেজ আবার আমার বাসার কাছেই। ও আমার কাছ থেকে মাঝে মাঝে বই-পুস্তক নিয়ে পড়ত। লক্ষ করলাম, ওর মাঝে ইসলামকে জানার ভীষণ আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। আমিও কুরআন, হাদিস, ইসলামি সাহিত্য পড়তে দিয়ে সাহায্য করতে থাকি। অসম্ভব বুদ্ধিমতী লাবণ্য অল্প দিনের মধ্যেই আল্লাহ পাকের বিধান খুব সহজেই বুঝে ফেলল।

ইতোমধ্যে বিয়ে হয়ে গেল লাবণ্যের। বিয়ে হলো ওর পছন্দ করা ছেলের সঙ্গেই। স্বামী দূরে কোথাও চাকরি করত। মাসে একবার আসত, দু-একদিন থেকেই আবার চলে যেত কর্মস্থলে। স্বামী ওর পরিবর্তনের কিছুই বুঝতে পারল না।

আমূল পরিবর্তন হলো ওর চালচলনে। হিজাবে আবৃত করে ফেলল নিজেকে। ইসলামকে জানা-মানা আর অপরের কাছে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালনে তৎপর হলো লাবণ্য। আমি একদিন বললাম, ‘লাবণ্য, তোমার স্বামী যদি এসব করতে নিষেধ করে তখন কী করবে?’ লাবণ্য পরম আস্থার সঙ্গে মাথা নেড়ে বলল, ‘না আপা, আমার স্বামী খুব ভালো মনের মানুষ। সে এসব পছন্দ করবে বলেই আমার বিশ্বাস, যদিও কুরআন-হাদিস সম্পর্কে তার তেমন ধারণা নেই।’

আশ্বস্ত হয়ে বললাম, ‘তাহলে তো ভালোই। অনেক চেষ্টা করে লাবণ্য ওর স্বামীকে বদলি করে কাছে নিয়ে এলো। অনেক স্বপ্ন দেখা শুরু করেছিল লাবণ্যের বাধাহীন মন। কাছে থাকলে স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে কুরআন-হাদিস পাঠ করতে পারবে, স্বামীর সঙ্গে ইসলামি সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করবে। কিন্তু স্বামী বদলি হয়ে কাছে এলে লাবণ্য পড়ল চরম বিপাকে। যে পরম আস্থা নিয়ে লাবণ্য বলেছিল, ‘আমার স্বামী খুব ভালো মনের মানুষ।’ সেই আস্থায় ভাঙন ধরল লাবণ্যের।

ভোর না হতেই উঠে নামাজ পড়াটা তবু সহ্য করল, কিন্তু কলেজে যাওয়ার সময় হিজাব পরতেই ড্র কুঁচকে সৌরভ প্রশ্ন করল, ‘ও কী! ওটা কী পরছ তুমি? তুমি জুব্বা পরছ কেন?’

মিষ্টি হেসে লাবণ্য বলল, ‘আমি মুসলমান হয়েছি।’

কথা শেষ করতে না দিয়ে সৌরভ চোঁচিয়ে উঠল, ‘তোমার মতো একজন শিক্ষিত, আধুনিক মেয়ে মাস্কাতার আমলের এই ড্রেস পরতে লজ্জা করল না? খোলো বলছি তোমার এই জুব্বা।’

লাবণ্য বলল, ‘তুমি কুরআন বিশ্বাস করো না? কুরআন মানো না?’

সৌরভ বলল, ‘কুরআন বিশ্বাস করব না কেন? অবশ্যই কুরআন মানি, কিন্তু গোঁড়ামি সহ্য করতে পারি না!’ লাবণ্য আর কথা না বাড়িয়ে হিজাব পরেই কলেজে চলে গেল।

সেদিন বিকেলেই এই নিয়ে আবার ঝামেলা বেঁধে গেল। লাবণ্যকে নিয়ে বেড়াতে যাবে সৌরভ। সবকিছু গুঁছিয়ে নিয়ে লাবণ্য হিজাব পরতেই রাগে ফেটে পড়ে সৌরভ।

আবার ওই জুঝা? ওই জুঝা পরে তুমি আমার সঙ্গে যেতে পারবে না। বলে রাগ করে ঘর থেকে বের হয়ে যায় সৌরভ। অনেক রাতে বাসায় ফেরে। রাগ করে সারা রাত কথা বলে না। সকালে নাস্তা খেতে বসে বলে, ‘লাবণ্য তোমার সঙ্গে একটা বোঝাপড়া আছে।’

জিজ্ঞাসু নেত্রে তাকিয়ে থাকে লাবণ্য। সৌরভ বলে, ‘তোমাকে যেকোনো একটি জিনিস ছাড়তে হবে।’

কম্পিত কণ্ঠে জানতে চায় লাবণ্য, ‘কী?’

‘হয় আমাকে ছাড়বে, নাহয় তোমার জুঝা ছাড়বে! ভাবার জন্য তোমাকে আজকের দিন সময় দিলাম। কাল সকালে সিদ্ধান্ত জানাবে।’

নিস্তব্ধ লাবণ্য। সৌরভ এসব কী বলছে! ভাষাহীন স্থির চোখ সৌরভের দিকে। আনমনা হয়ে যায় কিছুক্ষণ।

‘আমার কথা বুঝতে পেরেছ?’ উত্তর না পেয়ে জিজ্ঞেস করে সৌরভ। সংবিৎ ফিরে পায় লাবণ্য। একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলে, ‘ঠিক আছে।’

নির্ধুম রাত পার করে লাবণ্য। একটি মুহূর্তের জন্যেও চোখের পাতা এক করতে পারে না। মনে বারবার একটি কথা কড়া নাড়ছে, ‘আল্লাহ পাক তাকে এ কোন কঠিন পরীক্ষায় ফেললেন।’

পরদিন সৌরভ জানতে চায়, ‘সিদ্ধান্ত নিয়েছ?’

গম্ভীর কণ্ঠে উত্তর দেয় লাবণ্য, ‘নিয়েছি।’

‘কী সিদ্ধান্ত নিয়েছ?’

‘আমি একটাও ছাড়ব না।’

‘ঠাট্টা মনে করেছ? আমি কিন্তু সত্যিই চলে যাব। তুমি থাকো তোমার জুঝা নিয়ে।’ এই বলে সত্যি সত্যিই নাস্তা না করে বের হয়ে যায় সৌরভ।

লাবণ্য কান্নায় ভেঙে পড়ে। বারবার বলতে থাকে, ‘আল্লাহ! আমাকে রক্ষা করো। তোমার দ্বীনের ওপর অটল থাকার তাওফিক দাও।’

বিকেলেই আমার কাছে এসে সব জানায় লাভণ্য। বললাম, ‘তুমি তোমার সিদ্ধান্তে অটল থাকো। আল্লাহ তোমাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। এই ব্যাপারে তো কোনো আপস করা যাবে না বোন। আল্লাহ পাক যাকে যত বেশি ভালোবাসেন, তাঁর পরীক্ষা তত বেশি নেন। তোমার এই পরীক্ষা বিখ্যাত সাহাবি উম্মে সুলাইম (রা.)-এর মতো। ইসলাম গ্রহণ করার অপরাধে তাঁর স্বামী তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। আর উম্মে সুলাইম অটল থেকেছেন ঈমানের ওপর, তাঁর সিদ্ধান্তের ওপর। লাভণ্য, তুমি ধৈর্য ধরো! মহান আল্লাহ তোমাকে উত্তম প্রতিদান দেবেন। আমার বিশ্বাস, তোমার স্বামী নমনীয় হবেন, ইনশাআল্লাহ।’

হ্যাঁ, সপ্তাহ খানিকের মাঝেই সৌরভ নমনীয় হয়েছিল। লাভণ্য ওকে নিয়ে একদিন বেড়াতে এসেছিল আমার বাসায়। আমি পর্দার ওপাশ থেকে সালাম দিতেই সৌরভ বলেছিল, ‘আপনি কি আমার সামনে একটু আসবেন?’

বললাম, ‘কেন ভাই?’

আমি আপনাকে একটু দেখব।

আবার বললাম, ‘আমাকে দেখবে কেন?’

সৌরভ বলল, ‘আমার এমন শিক্ষিত স্মার্ট বউটাকে আপনি কীভাবে মৌলবাদী করে দিলেন? জুব্বা প্রেমে দেওয়ানা করে দিলেন? লাভণ্য এখন আমাকে ছাড়তে পারে, কিন্তু জুব্বা ছাড়তে পারবে না। অথচ এমন একটা সময় ছিল, যখন ও আমার জন্য দুনিয়া ছাড়তে পারত।’

বললাম, ‘ভাই আমি কিছুই করিনি। আল্লাহর তরফ থেকে আপনার স্ত্রী হেদায়েত পেয়েছেন। আমি তো শুধু আল্লাহর পথে ওকে দাওয়াত দিয়েছি। সে গ্রহণ না করলে আমার কিছুই করার ছিল না। হেদায়েতের মালিক মহান আল্লাহ তায়ালা।’

কথা বলার মধ্যে আমি কিছু নাস্তা ওপাশে পাঠালাম।

সৌরভ বলল, ‘আপনার দেওয়া নাস্তা আমি খাব না।’

বললাম, ‘কেন খাবেন না?’

‘খাব না। কী জানি কী জাদু-মন্ত্র এর মধ্যে মিশে দিয়েছেন কে জানে। এসব খেয়ে হয়তো দেখা যাবে আমিও জুব্বা পরতে শুরু করেছি।’

‘জাদু-মন্ত্র যখন বিশ্বাস করেন, মনটা তো তাহলে কুসংস্কারেই আচ্ছন্ন আছে। কী বলেন?’ আমি বললাম।

সৌরভ বলল, ‘আপনার ভেতর কী যেন এক সম্মোহনী ক্ষমতা আছে! কারণ, আপনার প্রতি যে রাগ আর অসন্তোষ নিয়ে এসেছিলাম, তা নিজের ভেতর কেন যেন আর খুঁজে পাচ্ছি না। মনে হচ্ছে আপনি জাদু জানেন। আপনার বাসায় আসাও নিরাপদ নয়।’

বললাম, ‘সৌরভ, আমি কি আপনার কোনো ক্ষতি করেছি? আমার প্রভাবেই যদি আপনার স্ত্রী কুরআনের পথে আসে, আল্লাহর পথে আসে, পর্দা করতে শুরু করে, এতে কি আপনি লাভবান হচ্ছেন না? রাসূল ﷺ বলেছেন—

“দাইউস কখনও জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর দাইউস হলো ওই পুরুষ, যে তার স্ত্রী-কন্যাকে পর্দায় রাখে না।” মুসনাদে আহমাদ

আমি আপনার বেপর্দা স্ত্রীকে যদি পর্দায় এনে থাকি, তাহলে কি আপনাকে দাইউস হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করলাম না? আপনার তো আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত। যদি বলি আপনাকে আমি ভালোবাসি, বিশ্বাস করবেন?’

সৌরভ বলল, ‘না’!

বললাম, ‘কেন বিশ্বাস করবেন না?’

‘প্রথম কথা আপনি আমাকে চেনেন না, দেখেননি। এমনকী যেটুকু পরিচয় হয়েছে, তাতে প্রমাণিত হয়েছে আমি আপনার আদর্শের ঘোর বিরোধী। অতএব, আপনি আমাকে ভালোবাসতেই পারেন না।’ সৌরভ বলল।

বললাম, ‘লাবণ্যের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রায় চার বছরের। শুধু হৃদয়তা বললে ভুল হবে, লাবণ্যের কাছে জেনে নেবেন, ও আমাকে কী পরিমাণ ভালোবাসে। আর ভালোবাসা নিশ্চয়ই একতরফা হয় না। সে আপনাকে তাঁর নিজের জীবনের চেয়েও বেশি ভালোবাসে। আপনাকে এখানে বদলি করে আনার জন্য লাবণ্যের কী পেরেশানি ছিল, তা হয়তো আপনি জানেন না। আমি লাবণ্যকে ভালোবাসি আর আপনি তো লাবণ্যের জীবন। এজন্য আপনাকে না দেখলেও আমি ভালোবাসি। আপনি যাতে বদলি হয়ে এখানে আসতে পারেন, আপনি যেন সুস্থ থাকেন, এর জন্য কতদিন নামাজের পরে দুআ করেছি। ভালো না বাসলে কি তার জন্য দুআ করা যায়? এখনো দুআ করছি, আল্লাহ পাক যেন আপনাকে সঠিক বুঝ দেন, আপনি যেন সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝতে পারেন। আপনি যেন ভালো থাকেন দুনিয়া ও আখিরাতে।’

সৌরভ একটু চুপ করে থেকে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেল।

আমার বাসায় এক পাশে একটি বড়ো বুকশেলফ আছে। সেখানে হরেক রকম বই রাখা আছে। সৌরভ বুক শেলফের সামনে দাঁড়িয়ে বইগুলো দেখতে থাকে। বই দেখতে দেখতে বলল, ‘আপনার বইয়ের কালেকশন তো খুব ভালো! নজরুল, ফররুখ, রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ দাশ,

তার মধ্যে মওদুদী, মাওলানা আব্দুর রহীম! এমন ব্যতিক্রম কালেকশন আমি আগে দেখিনি। আপনি নজরুল-রবীন্দ্রনাথও পড়েন? অবাক লাগছে!

হেসে দিয়ে বললাম, ‘কেন পড়ব না?’

‘আপনার দুই-একটা বই নিতে পারি?’

বললাম, ‘অবশ্যই?’

সৌরভ বেছে বেছে দুটো বই নিল। একটা আমার দেশ বাংলাদেশ। আর একটা কী তা এতদিন পরে মনে নেই। আর আমি আমার পছন্দের বই নামাজ রোজার হাকিকত ওকে দিলাম।

বললাম, ‘বইটি যেহেতু নিয়েছেন, পড়ে শেষ করুন। আশা করি অনেক প্রশ্নের উত্তর বই থেকেই পেয়ে যাবেন।’

সৌরভ সেদিন একটি বাঁকা হাসি দিয়ে চলে গেলেও সে আর কখনও লাভণ্যকে ইসলাম পালনে বাধা দেয়নি। শুনেছি নিজেও নামাজ পড়া শুরু করেছেন।

আর লাভণ্য শরিয়তের ব্যাপারে একটুও ছাড় দেয়নি। একটুও কমপ্রমাইজ করেনি। আজও টিকে আছে ওর দ্বীন ও ঈমান নিয়ে। মহান আল্লাহ তো বলেছেন—

‘আমি ঈমান এনেছি, এ কথা বললেই কি ছেড়ে দেবো? আল্লাহকে তো পরীক্ষা করে দেখতে হবে, ঈমানের দাবিতে কে সত্যবাদী আর কে মিথ্যাবাদী।’ সূরা আনকাবুত ১-২

ভালোবাসার কান্না

প্রায় অর্ধ-শতাব্দীর জীবন আমার। আত্মীয়স্বজন, স্বল্প পরিচিত, বহুদিনের পরিচিত, পাড়া-প্রতিবেশী ও ভাই-বোনদের অকৃত্রিম ভালোবাসায় পরিপূর্ণ এ জীবন। জানি না এত ভালোবাসা পাওয়ার কতটুকু যোগ্যতা আছে? এ যে আমার রবের, আমার মালিকের, আমার ইলাহর একান্তই দয়ার দান। সারা জীবন সিজদায় পড়ে থাকলেও তাঁর শুকরিয়া আদায় করে শেষ করা যাবে না।

এ ভালোবাসার একটা পার্থিব কারণ ইদানীং খুঁজে পেয়েছি। তা হলো, আমিও তাদের ভালোবাসি। অসম্ভব ভালোবাসি সবাইকে। কারও সঙ্গে কথা বললেই তাদের জন্য ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণ কামনায় ভরে উঠে হৃদয়-মন। সাধারণত কাউকে অবিশ্বাস করি না। কেন যেন অন্যের ত্রুটি সহজে নজরে পড়ে না। এর জন্য যে কোথাও ঠকিনি কিংবা ধোঁকা খাইনি, তা নয়। ঠকেছি, ধোঁকা খেয়েছি, আবার ভুলেও গেছি সেই তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা। তিক্ত কথা ও ব্যবহার যে যত তাড়াতাড়ি ভুলতে পারে, সে তত সুখী হতে পারে। মহান আল্লাহ এই অমূল্য সম্পদটি আমায় দান করেছেন। তাই তো কারও সঙ্গে দীর্ঘ সময় মনোমালিন্য থাকে না।

প্রতিবেশী ফাহিমের আন্মা একবার বাচ্চাদের ঝগড়াঝাটি নিয়ে বেশ কিছু কড়া কথা শুনিye গেলেন। পরদিন কোথাও যাওয়ার উদ্দেশ্যে বের হতেই তার সঙ্গে দেখা হলো। সালাম দিলাম। তিনি অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে রাখলেন। বাসায় ফেরার পথে আবার দেখা হলো তার সঙ্গে। আবার সালাম দিলাম। এবারও মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। পরদিন আবার দেখা হলো। সালাম দিলাম। এবার অন্যদিকে তাকিয়ে সালামের উত্তর দিলেন ভদ্রমহিলা। তার আচরণে কেমন যেন একটা কৌতুকবোধ হচ্ছিল, হাসি পাচ্ছিল।

হাসি মুখেই বললাম, ‘সালাম দিলাম আপনাকে, আর অন্যদিকে তাকিয়ে আপনি কাকে উত্তর দিচ্ছেন?’

ভদ্রমহিলা এবার আমার দিকে তাকালেন। ‘বললেন, ভালো আছেন তো?’

বললাম, ‘আলহামদুলিল্লাহ! আপনি ভালো তো?’

পরদিন সকালবেলা আরেক প্রতিবেশী মিলটনের আন্মা বেশ রাগত সুরেই বললেন, ‘আপা, আপনি কেন ফাহিমের আন্মার সঙ্গে কথা বলতে গেছেন? আপনার এমন কী দায় পড়েছিল?’

হাসি মুখে বললাম, ‘কেন, কী হয়েছে?’

‘ফাহিমের আন্মা সবার কাছে বলে বেড়াচ্ছেন, “তোমাদের আপনার সঙ্গে আমি জীবনেও কথা বলতাম না। মহিলা সেধে সেধে তিন দিন সালাম দেওয়ার পর নিরুপায় হয়ে কথা বলেছি। নইলে আমার মতো মেয়ে...”’

কথা শেষ করতে না দিয়ে বললাম, ‘সত্যি বলছেন? এই কথা ফাহিমের আন্মা বলেছেন?’

মিলটনের আন্মা আরও রেগে গেলেন। বললেন, ‘বলেছেন মানে? আরও প্রায় আট-দশজনের সামনে বলেছেন।’

বললাম, ‘আলহামদুলিল্লাহ! আপা, কথাটা একদম সত্যি। প্রথম দুদিন তো ফাহিমের আন্মা সালামের উত্তরই দেয়নি। তৃতীয় দিন উত্তর দিয়েছে অন্যদিকে তাকিয়ে। আর উনি যে সেই কথা আপনাদের কাছে বলেছেন, তার জন্য আমি খুব খুশি হয়েছি আপা।’

মিলটনের আন্মা অবাক হয়ে বললেন, ‘কেন আপা?’

বললাম, ‘আপনি ওই হাদিসটা তো জানেন, যে আগে সালাম দেয়, সে আল্লাহর অধিক নিকটবর্তী। প্রথমত, ফাহিমের আন্মা আপনাদের সবাইকে সাক্ষী রেখে বলেছেন, আমি আগে সালাম দিয়েছি। দ্বিতীয়ত, তিন দিনের বেশি কোনো মুসলমানের সঙ্গে কথা বন্ধ রাখলে তার কোনো ইবাদাত কবুল হয় না। এ হাদিসটাও তো জানেন। তাহলে বলুন তো, কীভাবে কথা না বলে থাকতে পারি? তা ছাড়া আমি নিজেই তো বিভিন্ন মাহফিলে এসব হাদিস বলি, এখন নিজেই যদি তার আমল না করি, কেমন হয় বলুন?’

লিটনের আন্মা আমার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। হাদিসের কথা উল্লেখ করায় হয়তো কিছু বলার ভাষা পাচ্ছেন না, নইলে আমাকে মনে হয় পাগল সাব্যস্ত করে যেতেন।

বিকেলেই ফাহিমের আন্মা এলেন। মাথা নিচু করে বললেন, ‘আপা, আমাকে মাফ করে দিন। আপনাকে নিয়ে বাজে কথা বলেছি।’

ফাহিমের আন্মার হাত ধরে বললাম, ‘কী যে বলেন না আপা, কী আর এমন বলেছেন? ওসব বাদ দিন তো। এক জায়গায় থাকলে কত কথাই তো হয়? আপন বোনের সঙ্গেও ঝগড়া হয়। আপনি আমার ছোটো বোনের মতো। কিছুই মনে করিনি।’

ফাহিমের আন্মার সঙ্গে এরপর অনেকদিন পাশাপাশি বাস করেছি। বদলি হয়ে চলে আসার সময় উনি খুব কেঁদেছিলেন। এটা ছিল নিখাদ ভালোবাসার কান্না।

শাশুড়ি-বধূর ভালোবাসার অভাব

শাশুড়ি আর পুত্রবধূর মধ্যে ভালোবাসার অভাবের কারণে অনেক পরিবারকে অশান্তির আগুনে জ্বলতে দেখেছি। ভালোবাসার অভাব সৃষ্টি হয় ত্যাগের মনোভাব না থাকার কারণে। তবে কিছুটা ক্ষমতার অপব্যবহারও করা হয়ে থাকে এখানে।

১৯৮৪ সালে হাফেজা আসমা খালাম্মা আমাকে বলেছিলেন, ‘যেখানে যাবে তোমার ব্যাগের মধ্যে বই রাখবে। পারলে বিক্রি করবে, না পারলে বিলি করবে। বই বিক্রি সর্বোত্তম দাওয়াতি কাজ।’ সেদিন থেকে যেখানেই যাই, বই আমার ব্যাগে থাকেই। আর কোনো মাহফিলে গেলে তো উদ্দেশ্যমূলকভাবেই বেশি করে বই নিই। বই কেনার জন্য যার সঙ্গে জোর করা যায়, তার সঙ্গে জোর করি; যাকে অনুরোধ করা যায়, অনুরোধ করি। বই বিক্রি করা আমার যেন নেশা! বই বিক্রির বহু মিষ্টি ও তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে।

বলছিলাম, শাশুড়ি ও পুত্রবধূর ক্ষমতার অপব্যবহারের কথা। তখন নওগাঁ শহরে থাকি। এক দাওয়াতি মাহফিলে আমি মেহমান। ছোটো-বড়ো বেশ কিছু বই নিয়ে গেছি। মাহফিল শেষ করেই বই বের করলাম। ততক্ষণে অনেকেই চলে যাচ্ছিলেন।

বললাম, ‘প্লিজ যাবেন না। বই না কেনেন, অন্তত একটু দেখে যান। কষ্ট করে নিয়ে এলাম আপনাদের জন্য।’ আর কেউ গেলেন না, সবাই বই দেখতে লাগলেন। আবার বললাম, ‘আপা বই কেনেন একটা, ভালো বই কেনা সদকায়ে জারিয়া। আপনার মৃত্যুর পরে এই বইটা যেই পড়ুক, কিয়ামত পর্যন্ত আপনার আমলনামায় তার সওয়াব লেখা হবে।’ এরপর আমার প্রায় সব বই বিক্রি হয়ে গেল।

যে বাসায় মাহফিল করছিলাম সেই আপা খুবই সমঝদার ও ধার্মিক মানুষ! তাঁর অল্প বয়স্ক নতুন পুত্রবধূ বেছে বেছে কয়েকটা বই হাতে তুলে নিয়ে বলল, ‘খালান্মা আমি এই বই কয়টা নেব।’

মনে মনে খুব খুশি হলাম। কিন্তু অবাক করে দিয়ে সেই বাসার আপা মানে বউটির শাশুড়ি বলে উঠলেন, ‘ঘরে কত বই তো আছে, সেগুলো পড়ো। তুমি আবার বই নিচ্ছ কেন?’ বউটি লজ্জা পেয়ে গেল। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে এদিক-ওদিক তাকাতে লাগল। বললাম, ‘আপা এগুলো নতুন বই। এই বই আপনার কাছে নেই। নিক না বেশি দাম তো নয়।’

‘না, রুমী আপা! বইয়ের দাম তো আমাকেই দিতে হবে।’

বললাম, ‘পরে দেবেন।’

‘না আপা, বই এখন দিয়েন না।’

মেয়েটি সব বই রেখে দিয়ে একটা বই হাতে নিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। একবার ইচ্ছে হলো বলি, ‘বইগুলো রেখে দাও, তোমাকে গিফট করলাম।’ কেন জানি বললাম না।

মেয়েটির নানি সেখানে বেড়াতে এসেছিল। সে তাকে বলল, ‘নানি আমাকে দশটা টাকা দাও, আমি এই বইটা কিনব।’

নানি তাকে দশ টাকা দিলেন। আমার সেই আপা পুত্রবধূর কথাও শুনলেন, নানির টাকা দেওয়াও দেখলেন। আমার এই ধার্মিক বোনটি ওই এলাকার মধ্যে সবচেয়ে ধনী। এত লোকের মধ্যে নিজের পুত্রবধূকে সামান্য টাকার জন্য লজ্জা দেওয়া ঠিক হয়নি। ভদ্র মহিলাকে কিছু বলতে চেয়েও বলতে পারিনি। বিশেষ করে বউটির সামনে তাকে কিছুই বলতে পারলাম না।

আরেক বোনের খোঁজ নিলাম। যিনি এই মাহফিলে আসেননি। অথচ আমি এসেছি এটা শোনার পর তাঁর আসার কথা! বাসাটাও কাছে। আমিই গেলাম খোঁজ নিতে। গিয়ে শুনি তাঁর পায়ের ব্যথা বেড়েছে। হাঁটতে পারছেন না। বললেন, ‘আপা, আপনি এসেছেন, অথচ আমি যেতে পারছি না। কী যে খারাপ লাগছিল! মনে মনে অবশ্য আশা করছিলাম আপনি আসবেন। এই দেখুন আপনার জন্য চিনি ছাড়া চা তৈরি করে রেখেছি।’

বললাম, ‘এত দূর এসে আপনার সঙ্গে দেখা না করে যাই কী করে বলুন তো?’ আমার বাসা নওগাঁ শহর থেকে প্রায় বিশ কিলোমিটার দূরে বদলগাছি থানায়। আমি এক পর্যায়ে একটু আগে উল্লিখিত শাশুড়ির কথা উঠলাম।

বললাম, ‘আপা, আমি ওই আপাকে এত লোকের সামনে কিছু বলতে পারলাম না। আবার কবে দেখা হবে, তাও ঠিক নেই। কিন্তু কথাটা বলা দরকার। আপনি বলবেন, রুমী আপা বলেছে,

‘আজকে যে ব্যবহার আপনি করলেন, আপনার ছেলের বউ সারা জীবনেও তা ভুলবে না। বউকে আপনি অন্য কোনো বই পড়াতে পারবেন বলেও মনে হয় না।’

এই আপা তখন বললেন, ‘আপা বই কয়টি আপনি গিফট করলেন না কেন? আপনি কত বই তো কতজনকে গিফট করেন!’

‘গিফট করার কথাটা যে আমারও মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু আমি থেমে গেছি। কারণ, এতে সেই শাশুড়ি মনে করত, আমি তাকে অপমান করলাম। তিনি বই কিনতে টাকা দিতে চাননি, সেখানে আমি গিফটের নামে বইগুলো দিয়ে যাচ্ছি, এটা খারাপ দেখায়।’

বোনটি কথার মধ্যে পায়ে ব্যথা নিয়ে চা নাস্তা দিতে উঠলেন। নিষেধ করলেও শুনলেন না। আমাকে বলার জন্য নাকি অনেক কথা জমা হয়ে আছে। সেই জমানো কথা তিনি বলছেন আর আমি অগ্রহভরে শুনছি। কথা চলার মধ্যে মেক্সি কাপড় বিক্রি করতে এক মহিলা এই বাড়িতে এলো। এই আপার শাশুড়ি একটা মেক্সি হাতে নিয়ে বলল, ‘বউমা, এই মেক্সিটা কিনলে হতো না?’

আপার মুখে একটা বিরক্তির ছায়া পড়ল। বললেন, ‘এক্ষুনি নিতে হবে? এখন টাকা নেই। পরে নেওয়া যাবে।’ শাশুড়ি তাড়াতাড়ি মেক্সিটা রেখে দিয়ে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। আমিও উঠে পড়লাম। বললাম, ‘আপা আর দেরি করব না। বাসায় পৌঁছতে রাত হয়ে যাবে।’ আমি দোতলা থেকে নিচে নেমে এলাম। আপার পায়ে ব্যথা বিধায় নামতে পারলেন না।

নিচে এসে দেখি ম্যাক্সিওয়ালি চলে যাচ্ছে। আপার শাশুড়ি জানালার গ্রিল ধরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন।

বললাম, ‘খালাম্মা, মেক্সি কার জন্য নিতে চেয়েছিলেন? খালাম্মা একটু ইতস্তত করে বললেন, ওই আমার বিধবা মেয়েটার জন্য।’ আমি মেক্সিটা দেড়শো টাকা দিয়ে কিনে খালাম্মার হাতে দিতেই খালাম্মা সসব্যস্ত হয়ে বললেন, ‘না মা, বউমা শুনলে রাগ করবে। আমার বিধবা মেয়েটার ওপর ঝড় যাবে।’

বললাম, ‘রাগ করবে না। রাগ করলে বলবেন, রুমী জোর করে দিয়ে গেছে।’ এই আপাই কিন্তু একটু আগে আমাকে পরামর্শ দিয়েছিলেন, বই কয়টি আপনি গিফট করলেন না কেন? তার পরামর্শ অনুযায়ী মেক্সিটা তার শাশুড়িকে গিফট করলাম। অবশ্য কয়েকদিন পরে আবার যখন দেখা হয়, আপা তখন আমার টাকাটা ফেরত দিয়েছিলেন।

এই দুজন আপাই যথেষ্ট ধনী। কুরআন-হাদিসও কম বোঝেন না, অথচ দুজনেই ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। একজন ছেলের বউয়ের ওপর নির্যাতন করছেন, আরেকজন শাশুড়ির ওপর। অথচ এই আচরণটুকু তারা না করলেও পারতেন। বছরখানেক পর খবর পেলাম, প্রথম আপার ছেলের বউ শাশুড়িকে একদম মানে না। নামাজ কালাম পড়ে না। মনে মনে বললাম, এমনটি হওয়াই তো স্বাভাবিক। এই দুটো পরিবারের অশান্তির জন্য আমি ওই দুজন আপাকেই দায়ী করব। তারা খুব ছোটো ছোটো ব্যাপারে স্বার্থত্যাগ করতে পারেননি।

এক সম্ভ্রান্ত পরিবারের কথা জানি। সে পরিবারের পুত্রবধূর পক্ষের কোনো মেহমান দেখলেই মুখ কালো হয়ে যায়। সে কারও সঙ্গে প্রাণ খুলে কথা বলে না। অথচ তার বাবার বাড়ির দিক থেকে কেউ এলে কত যে উষ্ণ অভ্যর্থনা! এ ধরনের পুত্রবধূ গ্রাম, গঞ্জ, শহর, ভদ্রলোক, ছোটলোক, নিম্নবিত্ত, মধ্যবিত্ত প্রায় সব ঘরেই পাওয়া যায়। এটাকে এক ধরনের রোগও বলা যায়। কুরআন মাজিদে মহান আল্লাহ মুনাফেকি ও কুফরিকেও রোগ বলেছেন। এই রোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে না পারলে, দুনিয়ার শান্তি আর আখিরাতের মুক্তি কিছুতেই পাওয়া যাবে না। এই রোগের নাম মনের কালিমা। মনের কালিমা দূর হয় অধিক পরিমাণে কুরআন পড়লে আর বেশি বেশি মৃত্যুর কথা স্মরণ করলে। আর এই রোগটা হয় অন্তরে ভালোবাসার অভাব হলে। বিভিন্ন ধরনের খাদ্যপ্রাণের অভাবে শরীরে যেমন নানা ধরনের রোগ দেখা দেয়, তেমনই ভালোবাসার ঘাটতি দেখা দিলে অন্তরে এসব রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়।

তাই তো রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে যেতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা মুমিন হবে। তোমরা ততক্ষণ মুমিন হতে পারবে না, যতক্ষণ না তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে।’ সহিহ মুসলিম : ৫৪

অন্য জায়গায় তো আরও কড়াভাবে বলেছেন—

‘যে ব্যক্তি ছোটোদের স্নেহ করে না এবং বড়োদের শ্রদ্ধা করে না, সে আমার দলভুক্ত নয়।’ মুসনাদে আহমাদ : ৬৯৩৭

‘আমার দলভুক্ত নয়’ কথাটির অর্থ, সে রাসূল ﷺ-এর উম্মতই নয়; অর্থাৎ মুসলমানই নয়। এই স্নেহ আর শ্রদ্ধা যা-ই বলি না কেন, মূলত এসব ভালোবাসারই বিভিন্ন নাম।

একই বাগানে যেমন বসরাই গোলাপ ফোটে, আবার ক্ষুদ্র ঘাসফুলও ফোটে। তেমনই সমাজের একদম তৃণমূল পর্যায় থেকে উচ্চস্তরের অনেকের ভালোবাসায় ধন্য, পরিপূর্ণ আমার এই হৃদয় বাগানটি।

আজ বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে অনুভব করি, আমার সেই ভালোবাসা সহস্র গুণ হয়ে ফিরে এসেছে আমার কাছে। দুনিয়ার এই সফর শেষ করে ফিরে যেতে হবে মহান মালিকের দরবারে। এই সুদীর্ঘ সফরে ভালোবাসাই তো একমাত্র মূলধন আমার! নওগাঁ জেলার ভাই-বোনেরা যে কী পরিমাণ আমাকে ভালোবাসেন, তা কাউকে বলে বোঝাতে পারব না। শুধু নওগাঁই বা বলি কেন? চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জে দুবছর ছিলাম। তাদের ভালোবাসার প্রতিদান দেওয়ার মতো আমার কী আছে? আমি যদি সেই সব ভালোবাসার উদাহরণ দিতে যাই, হাজার পৃষ্ঠায় লিখেও শেষ হবে না। ঢাকা শহরের ভাই-বোনেরা যে পরিমাণ ভালোবাসেন, তার কি তুলনা আছে? টাঙ্গাইল ভূয়াপুরের ভাই-বোনদের অসামান্য ভালোবাসায় অভিভূত হয়ে যাই। কোনো সম্পদই এমনি এমনি পাওয়া যায় না। তার জন্য চেষ্টা করতে হয়, আল্লাহর কাছে দুআ করতে হয়।

এই ভালোবাসার সম্পদে যদি আমরা সমৃদ্ধ হতে চাই, তাহলে এজন্য আমাদের সচেষ্টিত হতে হবে। আল্লাহর কাছে চাইতে হবে। দুআ করতে হবে। দুনিয়ার শান্তি আর আখিরাতের মুক্তি যে এর মধ্যেই নিহিত। ভালোবাসায় পূর্ণ থাকে যদি আমাদের মন, আমাদের গৃহ, আমাদের সমাজ, তাহলে জান্নাতি শিরিন শীতল বাতাস বয়ে যাবে আমাদের মনে, আমাদের ঘরে, আমাদের সমাজে। তা আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

‘প্রীতি ও প্রেমের পুণ্য বাঁধনে যবে মিলি পরস্পরে,
স্বর্গ আসিয়া দাঁড়ায় তখন আমাদেরই কুঁড়েঘরে।’

কবির এই কথাটি কতই না সত্য! তবে দেখতে হবে ভালোবাসতে গিয়ে যেন শরিয়তের সীমালঙ্ঘন না করি। আল্লাহর সন্তুষ্টির বাইরে কোনো ভালোবাসা নেই। মানুষের তথা সৃষ্টিকুলের ভালোবাসা পেতে হলে যা সবচেয়ে বড়ো প্রয়োজন কিংবা একমাত্র প্রয়োজন, তা হলো আল্লাহর ভালোবাসা। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘আল্লাহ রাব্বুল আলামিন যখন তাঁর কোনো বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন তিনি আকাশবাসীকে জানিয়ে দেন, আমি আমার অমুক বান্দাকে ভালোবাসি, তোমরাও তাকে ভালোবাস। আকাশবাসীরা তখন জমিনবাসীদের জানিয়ে দেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, আমরা আকাশবাসী ফেরেস্ভারাও তাকে ভালোবাসি। হে জমিনবাসী, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন সত্যপন্থী মানুষের অন্তরে ওই ব্যক্তির জন্য ভালোবাসার সৃষ্টি হয়। তাঁরা তাকে ভালোবাসে।’ সহিহ বুখারি

হিসাব অতি সহজ। মানুষের ভালোবাসা পেতে হলে আল্লাহকে ভালোবাসতে হবে। আর আল্লাহকে ভালোবাসতে হলে রাসূল ﷺ-কে ভালোবাসতে হবে। তাঁর আনিত শরিয়তের পাবন্দ হতে হবে। তাঁর দিক-নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। তাঁর আনুগত্য করতে হবে শর্তহীনভাবে। তাঁর নিষেধ থেকে সযত্নে নিজেকে দূরে রাখতে হবে। তিনি যেভাবে যে কাজ করতে, যে কথা বলতে এবং যে পথে চলতে বলেছেন, সেভাবে কাজ করা, কথা বলা এবং পথ চলার মধ্যেই আছে শান্তি আর ভালোবাসা।

আর পরিপূর্ণ শান্তি তো দুনিয়াতেই নেই। রাসূল ﷺ বলেছেন—

‘মহান আল্লাহ বলেন, “আমি শান্তিকে বন্দি করেছি জান্নাতে, মানুষ কী করে তা দুনিয়াতে খুঁজে পাবে? আমি সম্মান আর ভালোবাসাকে বন্দি করেছি আমার আনুগত্যের মধ্যে, মানুষ কী করে তা রাজা-বাদশাহর দরবারে খুঁজে পাবে?”’ হাদিসে কুদসি

যে যত আল্লাহর আনুগত্য করবে, রাসূল ﷺ-এর প্রদর্শিত পথে চলবে, দুনিয়া ও আখিরাতে সে তত সম্মান ও ভালোবাসা পাবে। রাজা-বাদশা, এমপি-মন্ত্রী, এদের কি মানুষ ভালোবাসে? সম্মান করে? স্বার্থের জন্য এদের পিছে পিছে ঘুরে হুজুর হুজুর, স্যার স্যার করে। ভয় পায়, আবার একটু আড়াল হলেই তারা অশ্লীল ভাষায় গালি দিতে কুণ্ঠাবোধ করে না।

উদাহরণ দেওয়ার জন্য বেশি দূরে যাওয়ার দরকার নেই। আজকের বাংলাদেশের দিকে তাকালেই দেখা যায়, কোথায় বড়ো বড়ো এমপি-মন্ত্রীদের সেই সম্মান, সেই ভালোবাসা? নিজেদের বাঁচানোর জন্য

তারা একে অপরের ওপর দোষারোপ করছে। হজরত খোবায়ের (রা.) কাফিরদের হাতে বন্দি হলেন। কাফিররা তাকে নির্মম নির্যাতন করে শহিদ করে দিলো। হত্যা করার আগে কাফিররা বলল, ‘তোমার পরিবর্তে যদি মোহাম্মদকে এখানে হত্যা করা হয়, তাহলে তোমার কী মনে হবে?’ খোবায়ের (রা.) বললেন, ‘আমাকে যদি বলো, আমার জীবনের বিনিময়ে আমার নবিজির পায়ে একটু কাঁটা ফুটুক, আমি তাতেও রাজি হব না।’

একইভাবে বর্তমান সময়ের কোনো ইসলামি নেতা কিংবা ইসলামি ব্যক্তিত্বকেও যদি কেউ খারাপ মন্তব্য করে, তখন সেটা আমাদের কলিজায় যেন আঘাত হানে। কারণ, এসব ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে আছেন। তাই তাদের ভালোবাসি, সম্মান করি।

আসুন গোলাপ চাষের মতো আমরা ভালোবাসার চাষ করি। ভালোবাসার ফুল ফুটুক আমাদের প্রত্যেক মুমিনের হৃদয়-আঙিনায়। সংসার সুরভিত হোক ভালোবাসার সৌরভে।

ভালোবাসার সিজদায় লুটাই আমাদের দেহ-মন ও মস্তিষ্ক। ভালোবাসার দুরূদ পাঠাই প্রিয়তম নবিজির শানে। ভালোবাসার কালেমা পড়ি। সবাইকে ভালোবাসি। আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

‘জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল, কিয়ামত কখন হবে?” রাসূল ﷺ বললেন, “তোমার কল্যাণ হোক, তুমি কি এর জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেছ?” তিনি বললেন, “তার জন্য আমি বিশেষ কোনো প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারিনি। তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে খুব ভালোবাসি।” রাসূল ﷺ বললেন, “তুমি যাকে ভালোবাসো, পরকালে তাঁর সঙ্গেই থাকবে।” আনাস (রা.) বলেন, সেদিন সমবেত মুসলমানগণ এত বেশি খুশি হয়েছিলেন যে, ইসলাম গ্রহণের পরে এত খুশি হতে আমি কখনও দেখিনি।’ সহিহ বুখারি ও মুসলিম

ভালোবাসার মতো অমূল্য মূলধন আর কিছু নজরে পড়ে না আমার। তাই তো আমি ভালোবাসি নিজে, পরিবার-পরিজনকে, আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবকে, দ্বীন ভাই-বোনদেরকে। কারও সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা হলেই তার জন্য ভালোবাসায় পূর্ণ হয়ে যায় হৃদয়টা। সর্বোপরি ভালোবাসি আমার প্রিয়তম নবিজি ﷺ-কে, মহান রাব্বুল আলামিনকে। আর আমি যতটা অন্যকে ভালোবাসি, তার চেয়ে সহস্রগুণ হয়ে সেই ভালোবাসা তাদের দিক থেকে আমার কাছে ফিরে আসে। আমি আপ্ত হই, অভিভূত হই! শুকরিয়া জানানোর ভাষা খুঁজে পাই না।

সত্যি বলছি, আমার নামাজ, আমার রোজাসহ অন্যান্য ইবাদাতের ওপর আমি কেন জানি ভরসা পাই না। খুব আশঙ্কা হয়, মহান মালিক আমার এসব ইবাদাত কবুল করবেন তো? তবে মহান রবের প্রতি আমার সুগভীর ভালোবাসার ওপর বিরাট আস্থা খুঁজে পাই। মনে হয়, আমার এই আমলটি আমার মহান রব কবুল করবেন ইনশাআল্লাহ। আর যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোনো ছায়া থাকবে না, সেদিন প্রিয়জনদের সঙ্গে আমাকেও স্থান দেবেন তাঁর আরশের ছায়াতলে। ভালোবাসায় ভরা হৃদয় নিয়ে আমি সেই দিনের প্রতীক্ষায় আছি!



ছোট ছোট আবেগ, অভিমান, অভিযোগ, খুনসুটি আর নিঃস্বার্থ ভালোবাসার সমষ্টি হলো পরিবার; যা মানব সভ্যতাকে বহুমান রেখেছে সৃষ্টির শুরু থেকে আজতক। পরিবার কাঠামো দাঁড়িয়ে থাকে ছোট কিছু ত্যাগ আর সমঝোতার ভিত্তির ওপরে। সম্পর্ক মধুর হয় পারস্পরিক বোঝাপড়া এবং দায়িত্বশীল উদার মনোভাবের গুণে। একটি সুস্থ সাজানো পরিবার উপহার দেয় একটি সৃজনশীল ও নান্দনিক জাতি; সার্থক করে পৃথিবীর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনকে। অন্যদিকে বিশৃঙ্খলতা ও ঘৃণার চাদরে মোড়ানো পরিবার উপহার দেয় একটি বদ্ধ ও জড় মস্তিষ্কসম্পন্ন জাতি; কলুষিত করে জীবনের সমস্ত বৈষয়িক শান্তিকে। তাই প্রতিটি পরিবার ভালোবাসা ও হৃদয়তায় পূর্ণ করে আগামীর সুন্দর পৃথিবী গঠনে এই বইটি হতে পারে একটি সম্ভাবনার বাতিঘর।


গার্ডিয়ান
 পাবলিকেশন্স
 ৩৪, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০
www.guardianpubs.com

বাতিঘর
 ISBN 978-984-8254-15-8

 9 789848 254158